প্রশ্নোত্তরে রমযান ও ঈদ

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

অধ্যাপক মোঃ নূরুল ইসলাম

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
আলী হাসান তৈয়ব

2012 - 1433

IslamHouse.com

﴿ أسئلة وأجوبة عن رمضان والعيد ﴾

« باللغة البنغالية »

الأستاذ محمد نور الإسلام

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

علي حسن طيب

2012 - 1433

IslamHouse.com

সূচীপত্র

	৮-ঈদের খুৎবা	
	৯-ঈদের জামাআত না পেলে	
	১০-ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়	
	১১-ঈদে যা বর্জনীয়	
27.	নফল সিয়াম	
	১-শাওয়াল মাসের ৬টি রোযা	
	২-যিলহাজ্জ মাসের ১ম দশকের সিয়াম	
	৩-আরাফার দিনের সিয়াম	
	৪-মুহাররম মাসের সওম	
	৫-আশুরার সওম	
	৬- প্রতি চন্দ্রমাসে ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে সিয়াম	
	৭-সাপ্তাহিক সোম ও বৃহস্পতিবারের সিয়াম	
	৮-শাবান মাসের সিয়াম	
	৯-এক দিন পর পর সিয়াম	
	১০-বিবাহে অসমর্থ যুবকদের সিয়াম	

১ম অধ্যায়

সিয়াম : অর্থ ও হুকুম

প্রশ্ন ১ : সিয়ামের শাব্দিক অর্থ কি?

উত্তর : সিয়ামের শাব্দিক অর্থ বিরত থাকা। ফার্সী ভাষায় এটাকে রোযা বলা হয়।

প্রশ্ন ২ : রমযান মাসের সিয়ামের হুকুম কি?

উত্তর : এটা ফরয।

প্রশ্ন ৩ : এটা কোন হিজরী সালে ফরয হয়েছে?

উত্তর : দ্বিতীয় হিজরীতে।

প্রশ্ন ৪ : সিয়াম ফরয হওয়ার দলীল জানতে চাই।

উত্তর :

(ক) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣ ﴾ [البقرة: ١٨٣]

[১] ঈমানদারগণ!, তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতের উপর। যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার। (বাকারাহ : ১৮৩)

﴿ شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ ...١٨٥ ﴾ [البقرة: ١٨٥]

[২] রমযান হলো সেই মাস যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছিল। মানবজাতির জন্য হিদায়াত ও সুস্পষ্ট পথ নির্দেশক এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য নির্ণয়কারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যারাই এ মাস পাবে তারা যেন অবশ্যই সিয়াম পালন করে। (বাকারাহ : ১৮৫)

(খ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً

ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি : এ মর্মে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর সত্যিকার কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া, হজ করা এবং রমযান মাসের সিয়াম পালন করা। (বুখারী : ৮; মুসলিম : ১৬)

২য় অধ্যায়

فضل شهر رمضان

রমযান মাসের ফযীলত

প্রশ্ন ৫ : রমযান মাসের ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : চন্দ্র মাসের এটা এক অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ মাস। এ মাসের ফযীলত অপরিসীম। নীচে ধারাবাহিকভাবে রমযান মাসের কিছু ফযীলত তুলে ধরা হল :

[১] ইসলামের পাঁচটি রুকনের একটি রুকন হল সিয়াম। আর এ সিয়াম পালন করা হয় এ মাসেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣ ﴾ [البقرة: ١٨٣]

অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার। (বাকারাহ : ১৮৩)

[২] এ মাসের সিয়াম পালন জান্নাত লাভের একটি মাধ্যম।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وآتى الزَّكَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনল, সালাত কায়েম করল, যাকাত আদায় করল, রমযান মাসে সিয়াম পালন করল

তার জন্য আল্লাহর উপর সে বান্দার অধিকার হল তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়া। (বুখারী : ২৭৯০)

[৩] রমযান হল কুরআন নাযিলের মাস

﴿ شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ ...١٨٥ ﴾ [البقرة: ١٨٥]

অর্থাৎ "রমাযান মাস- যার মধ্যে কুরআন নাযিল করা হয়েছে লোকেদের পথ প্রদর্শক এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট বর্ণনারূপে এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে।" (আল-বাকারা : ১৮৫)

সিয়াম যেমন এ মাসে, কুরআনও নাযিল হয়েছে এ মাসেই। ইতিপূর্বেকার তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জীলসহ যাবতীয় সকল আসমানী কিতাব এ মাহে রমযানেই নাযিল হয়েছিল। (সহীহ আল জামে)

এ মাসেই জিবরীল আলাইহিস সালাম নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কুরআন শুনাতেন এবং তাঁর কাছ থেকে তিলাওয়াত শুন্তেন। আর রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের শেষ রমযানে পূর্ণ কুরআন দু'বার খতম করেছেন। (মুসলিম)

[৪] রমযান মাসে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়।

إِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَأُغْلِقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنَ (وَفِيْ لَفْظٍ سُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنَ)

"যখন রমযান আসে তখন জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় আর জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদের আবদ্ধ করা হয়।" (মুসলিম : ২৫৪৭)

আর এজন্যই এ মাসে মানুষ ধর্ম-কর্ম ও নেক আমলের দিকে অধিক তৎপর হয় এবং মসজিদের মুসল্লীদের ভীড় অধিকতর হয়।

[৫] এ রমযান মাসের লাইলাতুল কদরের এক রাতের ইবাদত অপরাপর এক হাজার মাসের ইবাদতের চেয়েও বেশি। অর্থাৎ ৮৩ বছর ৪ মাসের ইবাদতের চেয়েও বেশি সাওয়াব হয় এ মাসের ঐ এক রজনীর ইবাদতে।

(ক) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝٣ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۝٤ سَلَٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۝٥ ﴾ [القدر: ٣، ٥]

অর্থাৎ "কদরের এক রাতের ইবাদত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। এ রাতে ফেরেশতা আর রূহ (জিব্রীল আঃ) তাদের রবের অনুমতিক্রমে প্রত্যেক কাজে দুনিয়ায় অবতীর্ণ হয়। (এ রাতে বিরাজ করে) শান্তি আর শান্তি- তা ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত থাকে।" (সূরা ক্বদর : ৪-৫)

(খ) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

.....لله فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حَرُمَ خَيْرُهَا فَقَدْ حَرُمَ

"এ মাসে এমন একটি রাত রয়েছে যা হাজার রাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হল সে মূলতঃ সকল কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হল।" (নাসায়ী : ২১০৬)

[৬] এ পুরো মাস জুড়ে দু'আ কবূল হয়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لِكُلِّ مُسْلِمٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُوْ بِهَا فِيْ رَمَضَانَ

অর্থাৎ "এ রমযান মাসে প্রত্যেক মুসলমান আল্লাহর সমীপে যে দু'আই করে থাকে-তা মঞ্জুর হয়ে যায়।" (আহমাদ : ২/২৫৪)

[৭] এ মাসে মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হয়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

إِنَّ لِلَّهِ عُتَقَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لِكُلِّ عَبْدٍ مِنْهُمْ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ

অর্থাৎ (মাহে রমাযানে) প্রতিরাত ও দিনের বেলায় বহু মানুষকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম থেকে মুক্তির ঘোষণা দিয়ে থাকেন এবং প্রতিটি রাত ও দিনের বেলায় প্রত্যেক মুসলিমের দু'আ- মুনাজাত কবূল করা হয়ে থাকে। (মুসনাদ আহমদ : ৭৪৫০)

[৮] এ মাস জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের মাস

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

يُنَادِيْ مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ : يَا بَاغِيَ الْخَيْرَ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلله عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ

"(এ মাসের)[1] প্রত্যেক রাতে একজন ঘোষণাকারী এ বলে আহবান করতে থাকে যে, হে কল্যাণের অনুসন্ধানকারী তুমি আরো অগ্রসর হও! হে অসৎ কাজের পথিক, তোমরা অন্যায় পথ চলা বন্ধ কর। (তুমি কি জান?) এ মাসের প্রতি রাতে আল্লাহ তা'আলা কত লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিযে থাকেন। (তিরমিযী : ৬৮২)

[৯] এ মাস ক্ষমা লাভের মাস

---

[1]. উল্লেখ্য, শুধু রমযানেই নয় পুরো বছর জুড়েই প্রতি রাতে এমন করা হয়।

এ মাস ক্ষমা লাভের মাস। এ মাস পাওয়ার পরও যারা তাদের আমলনামাকে পাপ-পঙ্কিলতা মুক্ত করতে পারল না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ধিক্কার দিয়ে বলেছেন :

رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانَ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَن يَّغْفِرَلَهُ

"ঐ ব্যক্তির নাক ধূলায় ধুসরিত হোক যার কাছে রমযান মাস এসে চলে গেল অথচ তার পাপগুলো ক্ষমা করিয়ে নিতে পারল না।" (তিরমিযী : ৩৫৪৫)

[১০] রমযান মাসে সৎ কর্মের প্রতিদান বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেয়া হয়

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ تَقَرَّبَ فِيْهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ وَمَنْ أَدَّى فِيْهِ فَرِيْضَةٌ كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ

'যে ব্যক্তি রমযান মাসে কোন একটি নফল ইবাদত করল, সে যেন অন্য মাসের একটি ফরয আদায় করল। আর রমযানে যে ব্যক্তি একটি ফরয আদায় করল, সে যেন অন্য মাসের ৭০টি ফরয আদায় করল।' (সহীহ ইবন খুযাইমা : ১৮৮৭, হাদীসটি দুর্বল)

[১১] এ মাসে একটি উমরা করলে একটি হজ্জ আদায়ের সওয়াব হয় এবং তা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হজ্জ আদায়ের মর্যাদা রাখে।

ক- হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

فَإِنَّ عُمْرَةً فِيْ رَمَضَانَ تَقْضِيْ حَجَّةً مَعِيْ

"রমযান মাসে উমরা করা আমার সাথে হজ্জ আদায় করার সমতুল্য"। (বুখারী : ১৮৬৩)

হাদীসে আছে,

খ-একজন মেয়েলোক এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করল,

مَا يَعْدِلُ حَجَّةً مَعَكَ؟ فَقَالَ : عُمْرَةٌ فِيْ رَمَضَانَ

"কোন ইবাদতে আপনার সাথী হয়ে হজ্জ করার সমতুল্য সাওয়াব পাওয়া যায়? তিনি উত্তর দিলেন, "রমযান মাসে উমরা করা" (আবূ দাউদ : ১৮৯৯০)

৩য় অধ্যায়

فضل الصيام

সিয়াম পালনের ফযীলত

প্রশ্ন ৬ : সিয়াম পালনকারীকে আল্লাহ কী কী পুরস্কার দেবেন?

উত্তর : সিয়াম পালনকারীকে যেসব পুরস্কার ও প্রতিদান আল্লাহ তা'আলা দেবেন তার অংশ বিশেষ এখানে উল্লেখ করা হল :

[১] আল্লাহ স্বয়ং নিজে সিয়ামের প্রতিদান দেবেন।

হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন :

كُلُّ عَمَلِ بَنِيْ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِئ بِهِ

"মানুষের প্রতিটি ভাল কাজ নিজের জন্য হয়ে থাকে, কিন্তু সিয়াম শুধুমাত্র আমার জন্য, অতএব আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব। (বুখারী : ১৯০৪)

[২] সিয়াম অতি উত্তম নেক আমল

আবূ হুরাইরাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র একটি হাদীসে তিনি বলেছিলেন :

يَا رَسُوْلَ اللهِ مُرْنِيْ بِعَمَلٍ، قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لاَ عَدْلَ لَهُ

"হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাকে একটি অতি উত্তম নেক আমলের নির্দেশ দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি সিয়াম পালন কর। কেননা এর সমমর্যাদা সম্পন্ন কোন আমল নেই।" (নাসাঈ : ২২২২)

অন্যান্য ইবাদত মানুষ দেখতে পায়। কিন্তু সিয়ামের মধ্যে তা নেই। লোক দেখানোর কোন আলামত সিয়াম পালনে থাকে না। শুধুই আল্লাহকে খুশী করার জন্য তা করা হয়। তাই এ ইবাদতের মধ্যে রয়েছে বিশুদ্ধ ইখলাস।

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِيْ

"সিয়াম পালনকারী শুধুমাত্র আমাকে খুশী করার জন্যই পানাহার ও যৌন উপভোগ পরিহার করে।' (১৮৯৪)

[৩] ক- জান্নাত লাভ সহজ হয়ে যাবে।

সহীহ ইবনু হিববান কিতাবে আছে আবূ উমামা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলেন-

يَا رَسُوْلَ اللهِ دُلَّنِيْ عَلَى عَمَلٍ أَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لاَ مِثْلَ لَهُ

আবূ উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন যার কারণে আমি জান্নাতে যেতে পারি। তিনি বললেন, তুমি সিয়াম পালন কর। কেননা এর সমমর্যাদাসম্পন্ন কোন ইবাদাত নেই। (নাসাঈ : ২২২১)

খ. সিয়াম পালনকারীকে বিনা হিসেবে প্রতিদান দেয়া হয়

অন্যান্য ইবাদতের প্রতিদান আল্লাহ তা'আলা তার দয়ার বদৌলতে ১০ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেন। কিন্তু সিয়ামের প্রতিদান ও তার সাওয়াব এর চেয়েও বেহিসেবী সংখ্যা দিয়ে গুণ দিয়ে বাড়িয়ে দেয়া হবে। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ (إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ)

"মানব সন্তানের প্রতিটি নেক আমলের প্রতিদান দশ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, কিন্তু সিয়ামের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সিয়াম শুধুমাত্র আমার জন্য, আমিই এর প্রতিদান দেব। (মুসলিম : ১১৫১)

অর্থাৎ কি পরিমাণ সংখ্যা দিয়ে গুণ করে এর প্রতিদান বাড়িয়ে দেয়া হবে এর কোন হিসাব নেই, শুধুমাত্র আল্লাহই জানেন সিয়ামের পুণ্যের ভান্ডার কত সুবিশাল হবে।

[৪] জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সিয়াম ঢাল স্বরূপ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ يَسْتَجِنُّ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ

"সিয়াম ঢাল স্বরূপ। এ দ্বারা বান্দা তার নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে পার।" (আহমাদ : ১৫২৯৯)

[৫] জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য সিয়াম একটি মজবুত দূর্গ

হাদীসে আছে,

اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ وَحِصْنُ حَصِيْنٌ مِنَ النَّارِ

"সিয়াম ঢালস্বরূপ এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচার এক মজবুত দূর্গ।" (আহমাদ : ৯২২৫)

[৬] আল্লাহর পথে সিয়াম পালনকারীকে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে দূরে রাখেন।

এ বিষয়ে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

ا- مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُوْمُ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ إِلاَّ بَاعَدَ اللهُ بِذَلِكَ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا

(ক) "যে কেউ আল্লাহর রাস্তায় (অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশী করার জন্য) একদিন সিয়াম পালন করবে, তদ্বারা আল্লাহ তাকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে সত্তর বছরের রাস্তা পরিমাণ দূরবর্তীস্থানে রাখবেন। (বুখারী : ২৮৪০; মুসলিম : ১১৫৩)

ب-مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بَاعَدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا

(খ) "যে ব্যক্তি একদিন আল্লাহর পথে সিয়াম পালন করবে আল্লাহ তার কাছ থেকে জাহান্নামকে সত্তর বছরের রাস্তা দূরে সরিয়ে নেবেন। (মুসলিম : ১১৫৩)

ج-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مُرْنِي بِأَمْرٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهِ قَالَ عَلَيْكَ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ لاَ مِثْلَ لَهُ

(গ) আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, "আমি আল্লাহর রাসূলকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি কাজের নির্দেশ দিন যার দ্বারা আমি লাভবান হতে পারি। তিনি বললেন, তুমি সিয়াম পালন কর। কেননা এর সমকক্ষ (মর্যাদা সম্পন্ন) কোন ইবাদত নেই। (নাসাঈ : ২২২১)

[৭] ইফতারের সময় বহু লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন।

হাদীসে আছে :

إِنَّ للهِ تَعَالَى عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ

ইফতারের মূহূর্তে আল্লাহ রাববুল 'আলামীন বহু লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। মুক্তির এ প্রক্রিয়াটি রমাযানের প্রতি রাতেই চলতে থাকে। (আহমাদ : ৫/২৫৬)

[৮] সিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মিশ্কের চেয়েও উত্তম (সুগন্ধিতে পরিণত হয়)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

وَالَّذِيْ نَفْسِ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ.

যার হাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র জীবন সে সত্তার শপথ করে বলছি, সিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহ তা'আলার কাছে মিশকের ঘ্রাণের চেয়েও প্রিয় হয়ে যায়। (বুখারী : ১৯০৪; মুসলিম : ১১৫১)

[৯] সিয়াম পালনকারীর জন্য রয়েছে দু'টি বিশেষ আনন্দ মুহূর্ত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ

সিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টো বিশেষ আনন্দ মুহূর্ত রয়েছে : একটি হল ইফতারের সময়, আর দ্বিতীয়টি হল তার রবের সাথে সাক্ষাতের সময়। (বুখারী : ৭৪৯২; মুসলিম : ১১৫১)

[১০] সিয়াম কিয়ামাতের দিন সুপারিশ করবে

হাদীসে আছে,

اَلصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ

সিয়াম ও কুরআন কিয়ামাতের দিন মানুষের জন্য এভাবে সুপারিশ করবে যে, সিয়াম বলবে হে আমার রব, আমি দিনের বেলায় তাকে (এ সিয়াম পালনকারীকে) পানাহার ও যৌনতা থেকে বিরত রেখেছি। তাই তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবূল কর।

অনুরূপভাবে কুরআন বলবে, হে আমার রব, আমাকে অধ্যয়নরত থাকায় রাতের ঘুম থেকে আমি তাকে বিরত রেখেছি। তাই তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবূল কর। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর উভয়ের সুপারিশই কবূল করা হবে। (আহমাদ : ২/১৭৪)

[১১] সিয়াম হল গুনাহের কাফফারা

(ক) আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ ... إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِۚ ﴿١١٤﴾ ﴾ [هود: ١١٤]

নিশ্চয়ই নেক আমল পাপরাশি দূর করে দেয়। (সূরা হুদ : ১১৪)

(খ) নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ (بخارى ومسلم)

পরিবার পরিজন, ধন-সম্পদ ও প্রতিবেশিদের নিয়ে জীবন চলার পথে যেসব গুনাহ মানুষের হয়ে যায় সালাত, সিয়াম ও দান খয়রাত সেসব গুনাহ মুছে ফেলে দেয়। (বুখারী : ৫২৫; মুসলিম : ১৪৪)

[১২] সিয়াম পালনকারীর এক রমযান থেকে পরবর্তী রমাযানের মধ্যবর্তী সময়ে হয়ে যাওয়া ছগীরা গুনাহগুলোকে মাফ করে দেয়া হয়।

ক- আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ۝٣١ ﴾ [النساء: ٣١]

"তোমরা যদি নিষিদ্ধ কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাক তাহলে তোমাদের ছগীরা গুনাহগুলোকে মুছে দেব এবং (জান্নাতে) তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাব। (সূরা নিসা : ৩১)

খ-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفَّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنِبَتِ الْكَبَائِرُ

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এর মধ্যবর্তী সময় ও এক জুমুআ থেকে অপর জুমুআ এবং এক রমযান থেকে অপর রমযান পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে হয়ে যাওয়া ছগীরা গুনাহগুলোকে (উল্লেখিত ইবাদতের) কাফ্ফারাস্বরূপ মুছে দেয়া হয় সে যদি কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। (মুসলিম : ২৩৩)

[১৩] সিয়াম পালনকারীর পূর্বেকার গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াব হাসিলের আশায় রমযানে সিয়াম পালন করবে, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (বুখারী : ৩৮; মুসলিম : ৭৬৯)

[১৪] সিয়াম যৌনপ্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে রাখে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

হে যুবকেরা! তোমাদের মধ্যে যে সামর্থ রাখে সে যেন বিবাহ করে। কেননা বিবাহ দৃষ্টি ও লজ্জাস্থানের হেফাযতকারী। আর যে ব্যক্তি বিবাহের সামর্থ রাখেনা সে যেন সিয়াম পালন করে। কারণ এটা তার জন্য নিবৃতকারী। (অর্থাৎ সিয়াম পালন যৌন প্রবৃত্তি নিবৃত করে রাখে) (বুখারী : ১৯০৫; মুসলিম : ১৪০০)

[১৫] সিয়াম পালনকারীরা রাইয়ান নামক মহিমান্বিত এক দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ

জান্নাতে একটি দরজা রয়েছে। যার নাম রাইয়্যান। কিয়ামতের দিন শুধু সিয়ামপালনকারীরা ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। তাদের ছাড়া অন্য কেউ সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। সেদিন ঘোষণা করা হবে, সিয়াম পালনকারীরা কোথায়? তখন তারা দাঁড়িয়ে যাবে ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করার জন্য। তারা প্রবেশ করার পর ঐ দরজাটি বন্ধ করে দেয়া হবে। ফলে তারা ব্যতীত অন্য কেউ আর সেই দরজা দিয়ে জান্নাতে ঢুকতে পারবেনা। (বুখারী : ১৮৯৬; মুসলিম : ১১৫২)

প্রশ্ন ৭ : কী ধরনের শর্ত পূরণ সাপেক্ষে উপরে বর্ণিত অফুরন্ত ফযীলত ও সওয়াব হাসিল করা যাবে?

উত্তর : সিয়ামের বরকতময় সাওয়াব ও পুরস্কার হাসিলের জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলী পূরণ করা আবশ্যক

[১] শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশী করার জন্য সিয়াম পালন করতে হবে। মনের মধ্যে লোক দেখানোর ইচ্ছা বা অপরকে শুনানোর কোন ক্ষুদ্র অনুভূতি থাকতে পারবে না।

[২] সিয়াম পালন, সাহরী, ইফতার ও তারাবীহসহ সকল ইবাদত রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাত তরীকামত পালন করতে হবে।

[৩] খাওয়া-দাওয়া ও যৌনাচার ত্যাগের মত মিথ্যা, প্রতারণা, সুদ, ঘুষ, অশ্লীলতা, ধোঁকাবাজি ও ঝগড়াবিবাদসহ সকল অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। চোখ, কান, জিহবা ও হাত পা সকল ইন্দ্রীয়কে অন্যায় কাজ থেকে হেফাযতে রাখতে হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أ-مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ (بخارى)

ক) যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ এবং মুর্খতা পরিত্যাগ করতে পারলনা, তার রোযা রেখে শুধুমাত্র পানাহার বর্জনে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। (বুখারী : ১৯০৩)

ب-...فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفَثْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ

খ) তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সিয়াম পালন করবে সে যেন অশ্লীল আচরণ ও চেচামেচি করা থেকে বিরত থাকে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় বা তার দিকে মারমুখী হয়ে আসে তবে সে যেন তাকে বলে 'আমি

রোযাদার'। (অর্থাৎ রোযা অবস্থায় আমি গালিগালাজ ও মারামারি করতে পারি না। (মুসলিম : ১১৫১)

ج-رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ (رواه أحمد)

গ) এমন অনেক রোযাদার আছে যার রোযা থেকে প্রাপ্তি হচ্ছে শুধুমাত্র ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। তেমনি কিছু নামাযী আছে যাদের নামায কোন নামাযই হচ্ছে না। শুধু যেন রাত জাগছে। (অর্থাৎ সালাত আদায় ও সিয়াম পালন সুন্নাত তরীকামত না হওয়ার কারণে এবং মিথ্যা প্রতারণা ও পাপাচার ত্যাগ না করায় তাদের রোযা ও নামায কোনটাই কবুল হচ্ছে না) (আহমাদ : ৮৮৪৩)

[৪] চতুর্থতঃ ঈমান ভঙ্গ হয়ে যায় বা ঈমান থেকে বহিস্কৃত হয়ে যায় এমন কোন পাপাচার থেকে বিরত থাকা

প্রশ্ন ৮ : কোন ধরনের পাপ করলে একজন মুসলিম ইসলাম থেকে বহিস্কৃত হয়ে যায়? একজন মুসলমান হয়ে যায় অমুসলমান- এ বিষয়ে জানতে চাই।

উ: অযু যেমন ছুটে যায়, নামায যেমন নষ্ট হয়, রোযাও যেমন ভঙ্গ হয়ে যায় তেমনি ইসলামও ছুটে যায়, ঈমানও ভঙ্গ হয় গুরুতর কিছু পাপের কারণে, ফলে ঐ পাপি ব্যক্তি মুসলমানের মিল্লাত থেকে বহিস্কৃত হয়ে যায়। অযূ, নামায, রোযা কী কারণে ভঙ্গ হয় তা আমরা জানি, কিন্তু ঈমান ভঙ্গ হয় এবং সেটা কী কারণে হয় তা আমরা অনেকেই জানি না। আর এটাই সবচেয়ে বড় বিপজ্জনক বিষয়। যে সব পাপের কারণে ইসলাম থেকে মানুষ বহিস্কৃত হয়ে যায় এবং তওবাহ না করলে কাফেরদের মতই চিরস্থায়ী জাহান্নামী হতে হবে সে বিষয়গুলো মাক্কা শরীফের দারুল হাদীসের শিক্ষক ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা মুহাম্মদ

বিন জামিল যাইনুর রচনাবলী থেকে এর সার সংক্ষেপ নিচে তুলে ধরা হলো :

ঈমান ভঙ্গকারী আমলসমূহ :

ঈমান ভঙ্গকারী কিছু পাপ কাজ আছে, যদি কোন মুসলিম এগুলোর কোন একটি পাপও করে ফেলে তবে সে শির্ক বা কুফুরী করে ফেলল। যার পরিণতিতে তার সমস্ত নেক আমল বরবাদ হয়ে যায়। এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। তবে জীবদ্দশায় তাওবাহ করে ফিরে এলে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিতে পারেন।

নিচে এ জাতীয় পাপকাজের একটি তালিকা তুলে ধরা হলো :

[১] আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট দু'আ করা। যেমন নবী বা মৃত আওলিয়াদের নিকট কিছু চাওয়া। অথবা কোন ওলি আওলিয়ার অনুপস্থিতিতে দূর থেকে তার কাছে সাহায্য চাওয়া। অথবা ঐ পীর বুজুর্গের উপস্থিতিতে তার কাছে এমন কিছু চাওয়া যা দেয়ার ক্ষমতা তার নেই।

এ সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٠٦﴾ ﴾ [يونس: ١٠٦]

"আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কাউকে ডেকো না, যে না করতে পারে তোমার কোন উপকার, আর না করতে পারে তোমার ক্ষতি। আর যদি তা করেই ফেল, তবে অবশ্যই তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" (অর্থাৎ তুমি মুশরিক হয়ে যাবে।") (ইউনুস : ১০৬)

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

(مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُوْنِ اللهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ)

অর্থাৎ যে, ব্যক্তি এ অবস্থায় মারা যায় যে, সে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সমকক্ষ দাঁড় করিয়ে তার কাছে সাহায্য চায়, তাহলে সে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে। (বুখারী : ৪২২)

[২] তাওহীদের কথা শুনে যাদের মনে বিতৃষ্ণা আসে এবং বিপদে আপদে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া থেকে দূরে থাকে। আর অন্তরে মুহাববতের সাথে ডাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং মৃত ওলি আওলিয়া ও জীবিত (অনুপস্থিত), পীর মাশায়েখদেরকে এবং সাহায্য চায় তাদেরই কাছে। এ বিষয়ে মুশরিকদের উদাহরণ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحۡدَهُ ٱشۡمَأَزَّتۡ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡأٓخِرَةِۖ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦٓ إِذَا هُمۡ يَسۡتَبۡشِرُونَ ٤٥ ﴾ [الزمر: ٤٥]

“যখন আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন আখিরাতের উপর বেঈমান লোকদের অন্তর বিতৃষ্ণায় ভরে যায়। আর যখন আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্য (পীর বুজুর্গের) নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন তাদের মনে আনন্দ লাগে। (যুমার : ৪৫)

[৩] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা কোন ওলির নাম নিয়ে পশু যবাই করা। এটা নিষেধ করে আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ٢ ﴾ [الكوثر: ٢]

“সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং তাঁরই জন্য যবেহ কর।” (কাওসার : ২)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে যবাই কার্য করে আল্লাহ তা'আলা প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেন। (মুসলিম : ১৯৭৮)

উল্লেখ্য যে, যবাইয়ের সময় কেউ যদি বলে, "খাজা বাবা জিন্দাবাদ" তাহলে এটা তার ঈমান ভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

[৪] কোন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মান্নত করা, যেমন কবরে মাযারে মান্নত করা (শিরনী দেয়া) অত্যন্ত গর্হিত কাজ ও ঈমান বিনষ্টকারী শির্ক ও কবীরা গুনাহ। কারণ, মান্নত একমাত্র আল্লাহর জন্যই হতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ ... رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ...۝٣٥ ﴾ [ال عمران: ٣٥]

"হে পালনকর্তা! আমার গর্ভে যে সন্তান রয়েছে আমি তাকে তোমার উদ্দেশ্যে মান্নত করলাম।" (আলে-ইমরান : ৩৫)

[৫] নৈকট্য লাভ ও ইবাদতের নিয়তে কোন কবরের চতুষ্পার্শে প্রদক্ষিণ বা তাওয়াফ করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا۟ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا۟ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا۟ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ۝٢٩ ﴾ [الحج: ٢٩]

"অতঃপর তারা যেন তাদের দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করে, তাদের মান্নত পূর্ণ করে, আর তারা যেন বেশি বেশি এ প্রাচীনতম (কাবা) ঘরের তাওয়াফ করে। (হাজ্জ : ২৯)

[৬] আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন

﴿ ... فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ﴿٨٤﴾ ﴾ [يونس: ٨٤]

“একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা কর যদি তোমরা মুসলিম হয়ে থাক।” (ইউনুস : ৮৪)

[৭] জেনে বুঝে কোন রাজা, বাদশা বা সম্মানিত কোন পীর বুজুর্গ জীবিত বা মৃত ব্যক্তিকে ইবাদতের নিয়তে রুকু বা সিজদা করা। কেননা রুকু বা সিজদা একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত ইবাদত।

[৮] ইসলামের রুকনসমূহ হতে কোন একটি রুকন বা ভিত্তিকে অস্বীকার করা। যথা : সালাত, সওম, হজ্জ ও যাকাত। অথবা ঈমানের ভিত্তিসমূহের কোন একটি ভিত্তিকে অস্বীকার করা। আর সেগুলো হলো আল্লাহ, তাঁর রাসূলগণ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাকদীরের ভালমন্দ আল্লাহর পক্ষ হতে এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান আনা। এছাড়াও দীনের অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় কার্যসমূহ যা দীনের অন্তর্ভুক্ত বলে সর্বজন বিদিত। এসবগুলোর উপর ঈমান আনতেই হবে। এর কোন একটিকে অস্বীকার করলেও ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়।

[৯] ইসলামী জীবন বিধান বা এর অংশ বিশেষকে ঘৃণা করা। এর কোন কোন বিধান পুরাতন ও অকেজো হয়ে গেছে মনে করা। আলেমগণ একমত হয়েছে এমন কোন ইবাদতের ক্ষেত্রে বা বৈষয়িক লেনদেন কিংবা অর্থনৈতিক কর্মকান্ড অথবা চারিত্রিক বিষয়ে ইসলামের উপদেশাবলীকে ঘৃণার চোখে দেখা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعۡسٗا لَّهُمۡ وَأَضَلَّ أَعۡمَٰلَهُمۡ ﴿٨﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ كَرِهُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحۡبَطَ أَعۡمَٰلَهُمۡ ﴿٩﴾ ﴾ [محمد: ٨، ٩]

“আর যারা কুফুরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে নিশ্চিত ধ্বংস। আর তাদের কর্মফল বরবাদ করে দেয়া হবে। ঐ কারণে যে, আল্লাহর নাযিল করা (কুরআন বা তার অংশ বিশেষকে) তারা অপছন্দের দৃষ্টিতে দেখে। ফলে আল্লাহ তাদের সকল নেক আমল বরবাদ করে দিবেন। (মুহাম্মাদ : ৯)

[১০] কুরআন কারীম বা সহীহ হাদীসের কোন বিষয় নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা। কিংবা ইসলামের কোন হুকুম আহকাম নিয়ে তামাশা করা।

এ বিষয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿ ... قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ۝ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ ... ۝ ﴾ [التوبة: ٦٥، ٦٦]

“বল, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছিলে? (কাজেই আজ আমার সামনে) তোমরা কোন ওজর আপত্তি পেশ করার চেষ্টা করোনা। ঈমান আনার পরও (সে বিদ্রূপের কারণে) পুনরায় অবশ্যই তোমরা কুফুরী করেছ।” (তাওবাহ : ৬৫-৬৬)

[১১] জেনে শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে কুরআন কারীমের কিংবা বিশুদ্ধ হাদীসের কোন অংশ বা কথা অস্বীকার করলে ইসলাম থেকে একেবারেই বহিস্কার হয়ে যায়। যদিও তা কোন ক্ষুদ্র বিষয়ে হোক।

[১২] মহান রবকে গালি দেয়া, দ্বীন ইসলামকে অভিশাপ দেয়া, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে গালি দেয়া বা তাঁর কোন অবস্থা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা, তার প্রদর্শিত জীবন বিধানের সমালোচনা করা। এ জাতীয় কর্মকান্ডের কোন একটি কাজ করলেও সে কাফির হয়ে যাবে।

[১৩] আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ অথবা তাঁর গুণাবলীর কোন একটিকেও অস্বীকার করা অথবা কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আল্লাহর কোন কার্যাবলী অস্বীকার করা বা এগুলোর অপব্যাখ্যা করা।

[১৪] রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস না করা, বা সবাইকে বিশ্বাস করলেও কোন একজন নবীকে অবিশ্বাস করা। অথবা নবী রাসূলদের কাউকে তুচ্ছ ধারণা করা বা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ ... لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ ... ﴿٢٨٥﴾ ﴾ [البقرة: ٢٨٥]

"আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কারো ব্যাপারে তারতম্য করি না।" (বাকারা : ২৮৫)

[১৫] আল্লাহ প্রদত্ত বিধান বাদ দিয়ে (মানব রচিত আইন দিয়ে) বিচার ফায়সালা করা- এ ধারণা করে যে, এ যুগে ইসলামের আইন কানুন আর চলবে না। কারণ এ আইন অনেক পুরাতন। অথবা আল্লাহ প্রদত্ত আইনের বিপরীতে মানব রচিত আইনকে জায়েয মনে করা এবং আল্লাহর আইনের উপর মানুষের তৈরী আইনকে প্রাধান্য দেয়া। ঈমান ভঙ্গের কারণ হিসেবে এটি একটি ধ্বংসাত্মক আকীদা। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ ... وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾ ﴾ [المائدة: ٤٤]

"আর যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী শাসন কার্য পরিচালনা করে না, তারা কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।" (আল-মায়িদা : ৪৪)

[১৬] ইসলামী বিচারে সন্তুষ্ট না হওয়া। ইসলামী বিচারে অন্তরে সংকোচ বোধ করা ও কষ্ট পাওয়া। বরং ইসলাম বহির্ভূত আইনের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে স্বস্তি বোধ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا ۝٦٥ ﴾ [النساء: ٦٥]

"কিন্তু না, (হে মুহাম্মদ!) তোমার রবের শপথ। তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্ববাদের মীমাংসার ভার তোমার উপর ন্যস্ত না করে, অতঃপর তোমার ফায়সালার ব্যাপারে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে, আর তারা সর্বান্তকরণে তার সামনে নিজেদেরকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করে।" (নিসা : ৬৫)

[১৭] আল্লাহর আইনের সাথে সাংঘর্ষিক এমন ধরনের আইন প্রণয়নের জন্য কোন মানুষকে ক্ষমতা প্রদান করা বা তা সমর্থন করা। অথবা ইসলামী আইনের সাথে সাংঘর্ষিক এমন ধরনের কোন আইনকে সঠিক বলে মেনে নেয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ ... ۝٢١ ﴾ [الشورا: ٢١]

"তাদের কি এমন অংশীদার আছে যারা তাদের জন্য এমন কোন জীবন বিধান প্রণয়ন (ও আইন কানুন তৈরী) করে নিয়েছে যার অনুমতি আল্লাহ তাদেরকে দেননি। (শূরা : ২১)

[১৮] আল্লাহ কর্তৃক বৈধকৃত কাজকে অবৈধ করে নেয়া এবং অবৈধ কাজকে বৈধ করে ফেলা। যেমন সুদকে বৈধ বা হালাল কাজ বলা কিংবা হালাল মনে করা ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ... ﴾ [البقرة: ٢٧٥]

"আর আল্লাহ ব্যবসাকে বৈধ করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম।" (আল-বাকারা : ১৭৫)

[১৯] আকীদা ধ্বংসাত্মক মতবাদের উপর ঈমান আনা। যেমন নাস্তিক্যবাদ, মাসুনিয়া, মার্কসবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা বা ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ, বা এমন জাতীয়তাবাদ যা আরবের অমুসলিমদেরকে অনাবর (আজমী) মুসলিমদের উপর প্রাধান্য দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴾ [ال عمران: ٨٥]

"আর যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছুকে দীন হিসেবে (অর্থাৎ জীবন বিধান হিসেবে) গ্রহণ করতে চাইবে, (আল্লাহর সমীপে) কক্ষনো তা কবূল করা হবে না। বরং সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (আলে ইমরান : ৮৫)

[২০] দ্বীনের বিধি বিধান পরিবর্তন করা, এবং ইসলাম ছেড়ে অন্য কোন ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করা অর্থাৎ মুরতাদ হয়ে যাওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٧]

"আর তোমাদের যে কেউ নিজের দ্বীন (ইসলাম) থেকে (অন্য ধর্মে) ফিরে যায়, অতঃপর সে ব্যক্তি কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তবে ঐ ধরনের লোকের (সমস্ত নেক) আমল, ইহকাল ও পরকাল উভয়জাহানেই বাতিল হয়ে যাবে। ফলে তারা হয়ে যাবে আগুনের বাসিন্দা। সেখানে (জাহান্নামে) তারা স্থায়ী হবে চিরকাল। (বাকারা : ২১৭)

[২১] মুসলমানদের বিরুদ্ধে অমুসলিমদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً ۗ ... ﴾ [ال عمران: ٢٨]

"মুমিনগণ যেন মুমিন লোক ছাড়া কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব না করে। যদি কেউ এমন কাজ করে তবে আল্লাহর সাথে তার আর কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে ব্যতিক্রম হলো যদি তোমরা তাদের যুল্ম হতে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর। (আলে ইমরান : ২৮)

[২২] অমুসলিমদেরকে অমুসলিম না বলা। কেননা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে তাদেরকে কাফির বলে আখ্যা দিয়েছেন। অতঃপর বলেছেন :

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ۝٦ ﴾ [البينة: ٦]

"নিশ্চয় কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফুরী করেছে, আর যারা মুশরিক তারা জাহান্নামের আগুনে চিরস্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই হল সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম।" (আর বাইয়্যেনা : ৬)

[২৩] এ আকীদা পোষণ করা যে, সবকিছুর মধ্যেই আল্লাহ রয়েছে। এমনকি কুকুর শুকরের মধ্যেও। গীর্জার পাদ্রীর মধ্যেও আল্লাহ রয়েছেন। আল্লাহই পাদ্রী। আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান এ আকীদাকে অহদাতুল উজূদ বলা হয়। এটা শির্কী চিন্তাধারা। এতে ঈমান ভঙ্গ হয়ে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয়ে যায়।

[২৪] দীনকে রাষ্ট্রীয় বিষয় হতে পৃথক করা। আর একথা বলা যে, ইসলামে রাজনীতি নেই। এরূপ ধারণা ও মন্তব্যও রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনাদর্শকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

[২৫] কিছু কিছু বিভ্রান্ত সুফীরা বলে যে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া পরিচালনার চাবি কুতব নামধারী কয়েকজন আওলিয়ার হাতে অর্পণ করেছেন। তাদের এ ধারণা আল্লাহর কার্যাবলীর সাথে শিরক বলে পরিগণিত হয়। এ আকীদা আল্লাহর বাণীর বিপক্ষে চলে যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ لَّهُۥ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۗ ﴾ [الزمر: ٦٣]

"আসমান ও যমীনের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার চাবি শুধুমাত্র আল্লাহরই হাতে। (যুমার : ৬৩)

উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো অযূ ভঙ্গের কারণসমূহের মতই ঈমান ভঙ্গকারী বিপজ্জনক উপাদান। এর কোন একটি আকীদা বা আমল কেউ যদি করে তাহলে সে লোকটি মুসলিম থেকে বহিষ্কার হয়ে যায়। ফলে তার সালাত, সাওম ইবাদত কবূলতো হবেই না। বরং অমুসলমান হয়ে আখিরাতে কাফিরদের সাথে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয়ে যাবে। (নাউযুবিল্লাহ)

প্রশ্ন ৯ : জেনে না জেনে বা ভুলে উপরে বর্ণিত কোন এক বা একাধিক পাপ যদি কেউ করে ফেলে তাহলে এ থেকে শুধরানোর উপায় কি?

উ: তাকে আবার নতুন করে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে। তাওবা করতে হবে খালেছ দিলে, অনুশোচনা করা ও অনুতপ্ত হতে হবে। ভবিষ্যতে এমন পাপের ধারে কাছেও আর যাবেনা, এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে। তার এ তাওবা হতে হবে মৃত্যুর পূর্বে। এতে ইনশাআল্লাহ তা'আলা তাওবা কবুল হবে এবং আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন। আল্লাহর নামতো তওয়াব এবং তিনি গাফুরুর রাহীম।

৪র্থ অধ্যায় :

فوائد الصيام

সিয়ামের শিক্ষা ও উপকারিতা

প্রশ্ন ১০ : সিয়ামের মধ্যে মানুষের জীবনে কী কী উপকার রয়েছে?

উত্তর : এর উপকারিতা বহুবিধ যার অংশবিশেষ নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

(ক) প্রথমতঃ মানসিক উপকারিতা

[১] সিয়াম তাকওয়া অর্জন ও আল্লাহ ভীরু হতে সহায়তা করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ۝١٨٣ ﴾ [البقرة: ١٨٣]

[১] ঈমানদারগণ!, তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতের উপর। যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার। (বাকারাহ : ১৮৩)

[২] শয়তানী শক্তি ও কু-প্রবৃত্তির ক্ষমতা দুর্বল করে দেয়। মানবদেহের শরীরের যে শিরা উপশিরা দিয়ে শয়তান চলাচল করে সিয়ামের ফলে সেগুলো নিস্তেজ ও কর্মহীন হয়ে পড়ে।

[৩] সিয়াম হল আল্লাহর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পন ও ইবাদতের প্রশিক্ষণ।

[৪] আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্য ধারণ ও হারাম বস্তু থেকে দূরে থাকার সহনশীলতার প্রশিক্ষণ দেয় এ সিয়াম।

[৫] ঈমান দৃঢ়করণ এবং বান্দার প্রতি আল্লাহর সার্বক্ষণিক নজরদারীর অনুভূতি সৃষ্টি করে দেয়। এজন্য রোযাদার লোকচক্ষুর আড়ালে গোপনেও কোন কিছু খায় না।

[৬] দুনিয়ার ভোগ বিলাসের মোহ কমিয়ে সিয়াম পালনকারীকে আখিরাতমূখী হওয়ার দীক্ষা দেয় এবং ইবাদতের প্রতি তার ক্ষেত্র প্রসারিত করে দেয়।

[৭] সিয়াম সাধনার ফলে বান্দা সৎ গুণাবলী ও সচ্চরিত্রের অধিকারী হয়ে থাকে।

[৮] সিয়ামে ক্ষুধার অনুভূতিতে অভাবী ও দরীদ্র জনগোষ্ঠীর দূরাবস্থা অনুধাবন করতে শিখায়। ফলে তাকে বঞ্চিত ও অনাহারী মানুষের প্রতি দয়াদ্র ও সহানুভুতিশীল করে তুলে।

[৯] সৃষ্ট জীবের সেবা করার দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়।

[১০] সিয়াম পালন আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সাহায্য করে।

[১১] এ রমযান বান্দাকে নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্তিতা শিক্ষা দেয়।

(খ) দ্বিতীয়তঃ দৈহিক উপকারিতা :

[১] সিয়াম মানব দেহে নতুন সূক্ষ্ম কোষ (ঈবষষ) গঠন করে থাকে।

[২] সিয়াম পাকস্থলী ও পরিপাকতন্ত্রকে বিশ্রাম দিয়ে থাকে। ফলে এগুলোর কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় এবং তা আবার সতেজ ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠে।

[৩]মোটা মানুষের স্থূলতা কমিয়ে আনতে সিয়াম সাহায্য করে।

[৪] মাত্রাতিরিক্ত ওজন কমিয়ে এনে অনেক রোগবালাই থেকে হিফাযত করে।

[৫] অনেক অভিজ্ঞ ডাক্তারের মতে ডাইবেটিস ও গ্যাস্ট্রিক রোগ নিরাময়ে সিয়াম ফলদায়ক ও এক প্রকার সহজ চিকিৎসা।

৫ম অধ্যায়

عقوبة تارك الصيام

সিয়াম ত্যাগকারীর শাস্তি

প্রশ্ন ১১ : যারা বিনা উযরে সিয়াম ভঙ্গ করে তাদের শাস্তি কী হবে?

উ: তারা ভীষণ শাস্তির সম্মুখীন হবে। এ বিষয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কয়েকটি হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হল :

[১] আবু উমামা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, একটি সম্প্রদায় উল্টোভাবে ঝুলছে। তাদের গালটি ফাড়া। তা থেকে রক্ত ঝরছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম এরা কারা? বলা হল, এরা ঐসব ব্যক্তি যারা বিনা উযরে রমযান মাসের সিয়াম ভঙ্গ করেছিল। (সহীহ ইবনে খুযাইমাহ)

[২] যে ব্যক্তি (রমাযানের) এ মুবারক মাসেও আল্লাহকে রাজী করাতে পারল না, সে বড়ই দুর্ভাগা। (ইবনে হিববান)

[৩] যে ব্যক্তি শরীয়তী উযর ছাড়া এ (রমযান) মাসে একটি রোযাও ছেড়ে দেবে, সে যদি এর বদলে সারা জীবনও সিয়াম পালন করে তবু তার পাপের খেসারত হবে না। (বুখারী)

৬ষ্ঠ অধ্যায়

رؤية الهلال

চাঁদ দেখা

প্রশ্ন ১২ : কিসের ভিত্তিতে সিয়াম পালন শুরু করতে হয়?

উত্তর : চাঁদ দেখার ভিত্তিতে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ

[১] তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখেই তা ভঙ্গ কর (অর্থাৎ ঈদ কর)। (বুখারী : ১৯০৯; নাসাঈ : ২১১৬)

تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلاَلَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ

[২] ইবনে 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মানুষ দলে দলে চাঁদ দেখতে শুরু করল। এমনি সময় আমি চাঁদ দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জানালাম। আমার এ সংবাদের উপর ভিত্তি করে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রাখলেন এবং সবাইকে রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন। (আবূ দাঊদ : ২৩৪)

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلاَلَ يَعْنِي رَمَضَانَ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ : يَا بِلاَلُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا

[৩] এক গ্রাম্য ব্যক্তি এসে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালেন, আমি তো চাঁদ দেখেছি অর্থাৎ রমাযানের চাঁদ। অতঃপর

রাসূল বললেন, তুমি কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-(কালিমার) উপর ঈমান এনেছ? লোকটি উত্তর দিল : হ্যাঁ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল) এ কথার উপর ঈমান এনেছ? লোকটি উত্তর দিল : হ্যাঁ। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবী বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু কে বললেন, হে বেলাল! মানুষকে জানিয়ে দাও, তারা যেন আগামীকাল থেকে রোযা রাখে। (আবূ দাঊদ : ২৩৪০ হাদীসটি দুর্বল)

প্রশ্ন ১৩ : কমপক্ষে কতজন লোকে চাঁদ দেখলে এ সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে?

উত্তর : কমপক্ষে একজন লোকে দেখলেও হবে। উপরে বর্ণিত হাদীসগুলো এর দলীল।

প্রশ্ন ১৪ : চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে সাক্ষীর কি ধরণের গুণাবলী থাকা দরকার?

উত্তর : একজন সাধারণ মানুষের সাক্ষ্যও গ্রহণ করা যাবে যদি তার সততা প্রশ্নবিদ্ধ না হয়। যদি তার আকল বুদ্ধিতে কোন দুর্বলতার ইঙ্গিত বহন না করে এবং এর মধ্যে যদি কোন ব্যক্তির স্বার্থ না থাকে।

প্রশ্ন ১৫ : আকাশ মেঘলা হলে বা অন্য কোন কারণে চাঁদ দেখা না গেলে কি করব?

উত্তর : এমন হলে ৩০ দিন পুরা করবে এবং এরপরের দিন থেকে সিয়াম পালন শুরু করবে। হাদীসে আছে-

الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ

মাস হল ২৯ রাত্রি। তবে চাঁদ না দেখে তোমরা রোযা রেখ না। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে ফলে চাঁদ দেখা না যায়, তবে ত্রিশ দিন পূর্ণ কর। (বুখারী : ১৮০৮)

প্রশ্ন ১৬ : পঞ্জিকা বা ক্যালেন্ডারের হিসাব অনুযায়ী রোযা রাখা যাবে কি?

উত্তর : না, চাঁদ না দেখে শুধুমাত্র পঞ্জিকার লেখা বা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী রোযা বা ঈদ করা যাবে না।

প্রশ্ন ১৭ : বিভিন্ন কারণে চাঁদ দেখতে না পারলেও রমযান হয়তো শুরু হয়ে গেছে এমন সন্দেহ করে রোযা রাখা শুরু করা যাবে কি?

উত্তর : সন্দেহের দিন থেকে রোযা রাখা শুরু করা- এটা কোন বুজুর্গী কাজ নয় বরং এটা গুনাহের কাজ। সন্দেহের দিন রোযা রাখতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পূর্ণ নিষেধ করেছেন। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করা বৈধ নয়। হাদীসে আছে,

مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ -صلى الله عليه وسلم-

যে ব্যক্তি সন্দেহ সংশয়পূর্ণ দিনে রোযা রাখবে সে নিশ্চিতই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অমান্য করল। (তিরমিযী : ৬৮৬)

প্রশ্ন ১৮ : অধিক পরহেযগারী কাজ মনে করে যদি কেউ দু' একদিন আগে থেকেই রোযা পালন শুরু করে তাহলে কি সওয়াব হবে?

উত্তর : না, হবে না। বরং এটা গুনাহের কাজ। হাদীসে আছে,

لاَ تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ صُومُوا لِلرُّؤْيَةِ وَأَفْطِرُوا لِلرُّؤْيَةِ فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَابَةٌ فَأَكْمِلُوا ثَلاَثِينَ

“তোমরা রমযান শুরু হওয়ার আগেই রোযা রাখা শুরু করো না। চাঁদ দেখে রোযা শুরু কর এবং পরবর্তী চাঁদ দেখেই রোযা রাখা বন্ধ কর। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে আরো একদিন অপেক্ষা করে (শাবান মাস) ত্রিশ দিন পূরণ কর।” (নাসাঈ : ২১৩০)

প্রশ্ন ১৯ : যে ব্যক্তি শাবান মাসে আগে থেকেই নফল রোযা রাখার অভ্যস্ত সে কি রমযান শুরু হওয়ায় আগের দু’ একদিন নফল রোযা রাখতে পারবে?

উত্তর : হ্যাঁ, ঐ ব্যক্তি পারবে। এ ধরণের লোকের জন্য তা বৈধ। হাদীসে আছে,

لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ

চাঁদ না দেখেই রোযা রাখা শুরু করে তোমরা রমযানকে এক বা দু’দিন এগিয়ে নিয়ে এসো না। (অর্থাৎ এক বা দু’দিন আগে থেকেই রোযা রাখা শুরু করে দিও না)।

তবে যে ব্যক্তি আগে থেকে নফল রোযা রাখতে অভ্যস্ত তার বিষয়টি ভিন্ন। (মুসলিম : ১০৮২)

প্রশ্ন ২০ : চাঁদ দেখার বিষয়টি নিশ্চিত হতে না পারায় কেউ যদি এমনভাবে নিয়ত করে যে, যদি চাঁদ উঠে থাকে তাহলে এটা আমার ফরজ রোযা আর যদি না উঠে থাকে তাহলে হবে নফল রোযা এরূপ দোদুল্যমান নিয়ত করা কি জায়েয হবে?

উত্তর : না, এরূপ নিয়ত করা জায়েয নয়। এমন সন্দেহজনক কোন রোযা শুদ্ধ হবে না।

প্রশ্ন ২১ : কেউ যদি দূরবীন দিয়ে চাঁদ দেখে তবে কি তা জায়েয?

উত্তর : হ্যাঁ, দেখতে পারে। এতে নিষেধের কিছু নেই। তবে দূরবীন ব্যবহার করা জরুরী নয়। মানুষের স্বাভাবিক দৃষ্টির উপর নির্ভর করাই যথেষ্ট।

প্রশ্ন ২২ : কখনো কখনো অনিশ্চিত ও উড়ো খবর পাওয়া যায় যে, চাঁদ দেখা গেছে সে ক্ষেত্রে কি করব?

উত্তর : যারা চাঁদ দেখবে তাদের প্রধান দায়িত্ব হল সরকারী কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো। অতঃপর সরকার বিষয়টি যাচাই করে যে সিদ্ধান্ত দেবে সে অনুযায়ীই জনগণ রোযা রাখবে। এক্ষেত্রে একক কোন ব্যক্তি বা কিছু লোক কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। সিদ্ধান্ত নেবে শুধু সরকার। অন্যেরা শুধু সরকারকে সহায়তা করতে পারে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالأَضْحٰى يَوْمَ تُضَحُّونَ

'যেদিন সকলে রোযা রাখবে তোমরাও সেদিন রোযা রাখবে ; যেদিন সকলে ঈদ করবে তোমরাও সেদিন ঈদ করবে। যেদিন সকলে ঈদুল আযহা উদযাপন করবে তোমরাও সেদিনই তা করবে। (অর্থাৎ জনগণ বা জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন কিছু করো না)'। (তিরমিযী : ৬৯৭)

প্রশ্ন ২৩ : যদি এমন হয় যে, আমি চাঁদ দেখলাম। কিন্তু আমার সাক্ষ্য সরকার গ্রহণ করল না। এমতাবস্থায় কী করব?

উত্তর : এ অবস্থায় চুপচাপ থাকাই উত্তম। যাচাই বাছাই পূর্বক সরকার যে সিদ্ধান্ত দেবে সেটাই মেনে নেবেন। জামাতচ্যুত হওয়া বৈধ নয়। সকলের সাথে থাকাই এক্ষেত্রে ওয়াজিব। (ফতওয়া ইবনে তাইমিয়া খণ্ড ২৫, পৃঃ ২১৪-২১৮)

এ বিষয়ে উলামায়ে কিরামের ২য় আরেকটি মত হল, যে ব্যক্তি স্বচক্ষে চাঁদ দেখবে সে একাকী হলেও রোযা রাখবে। আর রাখতে না পারেল তা পরে কাযা করে নিবে। (কুদুরী)

৭ম অধ্যায়

على من يجب الصيام

সিয়াম কাদের উপর ফরয

প্রশ্ন ২৪ : কাদের উপর সিয়াম পালন ফরয?

উত্তর : (১) প্রাপ্ত বয়স্ক, (২) সুস্থ বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন, (৩) মুকীম ও সমর্থবান এমন সব গুণ সম্পন্ন প্রত্যেক মুসিলম নর-নারীর উপর সিয়াম পালন করা ফরয।

প্রশ্ন ২৫ : কী অবস্থায় কাদের উপর সিয়াম ফরয নয়?

উ: নিম্নবর্ণিত দশপ্রকার মানুষের উপর সিয়াম পালন ফরয নয়, তারা হল :

[১] অমুসলিম

[২] অপ্রাপ্ত বয়স্ক/ অর্থাৎ নাবালেগ

[৩] পাগল

[৪] এমন বৃদ্ধলোক যে ভাল-মন্দ পার্থক্য করতে পারে না

[৫] এমন বৃদ্ধ ব্যক্তি যে রোযা রাখতে সমর্থ নয়। বা এমন রোগী যার রোগমুক্তির সম্ভাবনা নেই। এমন ব্যক্তিদের উপর ফিদইয়া দেয়া ওয়াজিব।

[৬] মুসাফির

[৭] রোগাক্রান্ত ব্যক্তি

[৮] ঋতুবতী মহিলা

[৯] গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী নারী

[১০] দুর্ঘটনায় পতিত বা বিপদগ্রস্ত লোককে রক্ষাকারী ব্যক্তি।

৮ম অধ্যায়

সিয়াম অবস্থায় যা অবশ্য করণীয়

প্রশ্ন ২৬ : সিয়াম পালনের ক্ষেত্রে কী কী কাজ ও আমল অত্যাবশ্যক?

উত্তর : সিয়াম অবস্থায় অত্যাবশ্যকীয় আমলসমূহ :

[১] পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত আদায় করা। কোন শরয়ী উযর না থাকলে সালাত মাসজিদে গিয়ে জামাআতের সাথে আদায় করা। জামাআতে সালাত আদায়কে বিজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম ওয়াজিব বলেছেন। যারা জামাআতের সাথে সালাত আদায় করে না তারা ২৭ গুণ সাওয়াব থেকে বঞ্চিততো হয়ই, উপরন্তু ফজর ও ঈশার জামাআত পরিত্যাগকারীকে হাদীসে মুনাফিকের সাথে তুলনা করা হয়েছে। যারা অবহেলা করে বিনা ওযরে সালাত দেরী করে আদায় করে তার সালাত একশবার পড়লেও তা কবুল হবে না বলে উলামায়ে কিরাম মন্তব্য করেছেন। আর মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় থেকে বিরত থাকতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্ধ ব্যক্তিকেও অনুমতি প্রদান করেন নি।

[২] মিথ্যা না বলা।

[৩] গীবত না করা- আর তা হলো অসাক্ষাতে কারো দোষত্রুটি বা সমালোচনা করা

[৪] চোগলখোরী না করা- আর তা হলো এক জনের বিরুদ্ধে আরেকজনকে কিছু বলে ক্ষেপিয়ে তোলা ও ঝগড়া লাগিয়ে দেয়া।

[৪] ক্রয় বিক্রয় ও অন্যান্য কাজে কাউকে ধোঁকা না দেয়া।

[৫] গান গাওয়া ও বাদ্যযন্ত্র বাজানো থেকে বিরত থাকা, মধুর কণ্ঠে গাওয়া যৌন উত্তেজনামূলক গান থেকে আরো বেশি সাবধান থাকা।

[৬] সকল প্রকার হারাম কাজ-কর্ম পরিহার করা।

জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,

إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ عِنْدَ الْكَذِبِ وَالْمَحَارِمِ وَدَعْ عَنْكَ أَذَى الْجَارِ وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَار وَسَكِيْنَة وَلاَ يَكُنْ يَوْمُ صَوْمِكَ وَيَوْمُ فِطْرِكَ سَوَاء

যখন তুমি রোযা রাখবে তখন যেন তোমার কর্ণ, চক্ষু এবং জিহবাও মিথ্যা ও হারাম কাজ থেকে রোযা রাখে। তুমি প্রতিবেশিকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকো। আত্মমর্যাদা ও প্রশান্তভাব যেন তোমার উপর বজায় থাকে এমন হলে তোমার রোযা রাখা ও না রাখা সমান হবে না। (ইবন আবী শাইবা : ৮৮৮০)

[৭] ইসলামকে জীবনের সকলক্ষেত্রে অনুসরণ করা।

মসজিদে যেমনভাবে ইসলাম তেমনি পরিবার, সমাজ, ব্যবসা এবং রাষ্ট্রীয় জীবনেও ইসলামকে একমাত্র জীবন বিধান হিসেবে বাস্তবায়ন করা।

আল্লাহ বলেন,

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةً ﴾ [البقرة: ٢٠٨]

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইসলামে দাখিল হও পরিপূর্ণভাবে (অর্থাৎ জীবনের সর্বক্ষেত্রে)। (বাকারাহ ২০৮)

[৮] সিয়াম আবস্থায় পাপাচার ত্যাগ করা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلاَّ الظَّمْأَ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلاَّ السَّهْر

(ক) কত সিয়াম পালনকারী আছে যাদের রোযা হবে শুধু উপোস থাকা। আর কতলোক রাতের ইবাদতকারী আছে যাদের রাত জাগরণ ছাড়া ইবাদতের কিছুই হবে না। (অর্থাৎ পাপকাজ থেকে বিরত না হওয়ার কারণে তার রোযা যেন রোযা নয়, তার রাতের সালাতও যেন ইবাদত নয়)। (আহমাদ : ৯৬৮৩; দারেমী : ২৭৬২)

فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ

(খ) তোমাদের মধ্যে কেউ যদি রোযা রাখে, সে যেন তখন অশ্লীল কাজ ও শোরগোল থেকে বিরত থাকে। রোযা রাখা অবস্থায় কেউ যদি তাকে গালাগালি ও তার সাথে মারামারি করতে আসে, সে যেন বলে "আমি রোযাদার"। (মুসলিম : ১১৫১)

لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ

(গ) শুধুমাত্র পানাহার ত্যাগের নাম রোযা নয়, প্রকৃত রোযা হল (সিয়াম অবস্থায়) বেহুদা ও অশ্লীল কথা এবং কাজ থেকে বিরত থাকা। (ইবনু খুযাইমা : ১৯৯৬)

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

(ঘ) যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ এবং অজ্ঞতা থেকে মুক্ত হতে পারেনি সে ব্যক্তির শুধুমাত্র পানাহার বর্জনের (এ সিয়ামে) আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। (বুখারী : ৬০৫৭)

[৯] রোযা রাখা (ও অন্যান্য ইবাদত) একমাত্র আল্লাহকে খুশী করার জন্য করা। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ ... ﴾ [البينة: ٥]

"মানুষকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তাদের ইবাদত যেন শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশী করার জন্য হয়।" (বাইয়্যেনাহ : ৫)

[১০] সকল হুকুম আহকাম পালনে নাবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র সুন্নাত তরীকা অনুসরণ করা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"যে ব্যক্তি এমন (তরীকায়) কোন আমল করল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্দেশিত সেই কাজ আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য তো হবেই না রবং) তা হবে প্রত্যাখ্যাত'। (মুসলিম : ১৭১৮)

[১১] সিয়াম ভঙ্গের সহায়ক কাজ-কর্ম পরিহার করা স্বামী-স্ত্রীর আলিঙ্গন, চুম্বন বা একত্রে শয়ন জায়েয হলেও তা যেন রোযা ভঙ্গের পর্যায়ে নিয়ে না যায় সে বিষয়ে সতর্ক থাকা।

[১২] অন্তরে ভয় ও আশা পোষণ করা।

কোন অজানা ভুলের জন্য রোযাটি ভেঙ্গে যায় কিনা এ ধরনের ভয় থাকা এবং আল্লাহর কাছে এর প্রতিদান পাবো এ আশাও পোষণ করা। অন্তরকে এ দু'য়ের মধ্যে সামঞ্জস্য করে রাখতে হবে।

৯ম অধ্যায়

সিয়ামের সুন্নাত আদব

প্রশ্ন ২৭: প্রত্যেক ইবাদতেরই কিছু আদব কায়দা ও শিষ্টাচার রয়েছে, সিয়ামের আদবগুলো কী কী?

উত্তর : সিয়াম পালনের কিছু মুস্তাহাব বা সুন্নাত আদব আছে যেগুলো পালন করলে সাওয়াব বেড়ে যাবে। আর তা ছেড়ে দিলে রোযা ভঙ্গ হবে না বা গোনাহও হবে না। তবে পুণ্যে ঘাটতি হবে। কিন্তু তা আদায় করলে সওয়াবের পরিপূর্ণতা আসে। নিম্নে এসব আদব উল্লেখ করা হল :

[১] সাহরী খাওয়া।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

(ক) তোমরা সাহরী খাও, কারণ সাহরীতে বরকত রয়েছে। (বুখারী : ১৯২৩; মুসলিম : ১০৯৫)

مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ

(খ) আমাদের (মুসলিমদের) ও ইয়াহূদী-নাসারাদের সিয়ামের মধ্যে পার্থক্য হল সাহরী খাওয়া। (মুসলিম : ১০৯৬)

অর্থাৎ আমরা সিয়াম পালন করি সাহরী খেয়ে, আর ইয়াহূদী-নাসারারা রোযা রাখে সাহরী না খেয়ে।

نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ

(গ) মু'মিনের সাহরীতে উত্তম খাবার হল খেজুর। (আবূ দাঊদ : ২৩৪৫)

السَّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ فَلاَ تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ

(ঘ) (রোযাদারদের জন্য) সাহরী হল একটি বরকতময় খাবার। তাই কখনো সাহরী খাওয়া বাদ দিও না। এক ঢোক পানি পান করে হলেও সাহরী খেয়ে নাও। কেননা সাহরীর খাবার গ্রহণকারীকে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর ফেরেশতারা স্মরণ করে থাকেন। (আহামদ : ১০৭০২)

[২] সাহরী দেরী করে খাওয়া।

অর্থাৎ তা শেষ ওয়াক্তে খাওয়া উত্তম। রাতের শেষাংশে গ্রহণকৃত খাবারকে সাহরী বলা হয়।

[৩] সাহরীর সময়কে ইবাদতে কাজে লাগানো। প্রতিরাতের শেষ তৃতীয়াংশ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরশ থেকে প্রথম আসমানে নেমে আসেন। আর বান্দাদেরকে এই বলে আহবান করেন :

مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

"এখন যে ব্যক্তি আমার কাছে দু'আ করবে আমি তা কবূল করব, যা কিছু আমার কাছে এখন চাইবে আমি তাকে তা দিব এবং যে আমার কাছে এখন মাফ চাইবে আমি তাকে মাফ করে দিব। (বুখারী : ৬৩২১; মুসলিম : ৭৫৮)

অতএব তখন কুরআন অধ্যয়ন, তিলাওয়াত, তাহাজ্জুদের সালাত আদায়, তাওবাহ-ইস্তিগফার ও দু'আ কবূলের জন্য এটা এক উত্তম সময়। তাদের প্রশংসায় আল্লাহ বলেন :

﴿ وَبِٱلۡأَسۡحَارِ هُمۡ يَسۡتَغۡفِرُونَ ١٨ ﴾ [الذاريات: ١٨]

"তারা শেষ রাতে জেগে উঠে তাওবাহ-ইস্তিগফার করে।" (সূরাহ যারিয়াত-১৮)

[৪] সূর্য অস্ত যাওয়ামাত্র ইফতার করা অর্থাৎ তাড়াতাড়ি ইফতার করা। অতিরঞ্জিত সাবধানতার নামে ইফতার বিলম্ব না করা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

(ক) অর্থাৎ মানুষ যতদিন পর্যন্ত তাড়াতাড়ি ইফতার করবে ততদিন কল্যাণের মধ্যে থাকবে। (বুখারী : ১৯৫৭; মুসলিম : ১০৯৮)

لاَ يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ

(খ) যতদিন মানুষ তাড়াতাড়ি ইফতার করবে ততদিন দীন ইসলাম বিজয়ী থাকবে। কেননা, ইয়াহূদী ও নাসারাদের অভ্যাস হল ইফাতর দেরীতে করা। (আবূ দাঊদ : ২৩৫৩)

ثَلاَثَةٌ مِنْ أَخْلاَقِ النُّبُوَّةِ : تَعْجِيْلُ الإِفْطَارِ وَتَأْخِيْرُ السَّحُوْرِ وَوَضْعِ الْيَمِيْنِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلاَةِ

(গ) তিনটি বিষয় নাবী চরিত্রের অংশ : সময় হওয়ামাত্র ইফতার করে ফেলা, সাহরী শেষ ওয়াক্তে খাওয়া এবং সালাতে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ১০৫)

كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- أَسْرَعُ النَّاسَ إِفْطَارًا وَأَبْطَأُهُمْ سُحُوْرًا

(ঘ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবীগণ সকলের আগে তাড়াতাড়ি ইফতার করতেন এবং সকলের চেয়ে দেরীতে সাহরী খেতেন। (মুসান্নাফ আঃ রাযযাক : ৭৫৯১)

[৬] মাগরিবের সালাতের পূর্বে ইফতার করা এবং খেজুর বা পানি দ্বারা ইফতার করা।

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَن يُّصَلِّيَ...

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মাগরিবের) সালাতের পুর্বে তাজা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। যদি তাজা খেজুর পাওয়া না যেত তবে শুকনো খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। আর যদি শুকনা খেজুর পাওয়া না যেত তাহলে কয়েক ঢোক পানি দ্বারা ইফতার করতেন। (আহমাদ : ৩/১৬৪)

তবে পেট ভর্তি করে খাওয়া ইসলাম সমর্থন করে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন

مَا مَلأُ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً بَطْنِهِ

"যে ব্যক্তি পেট ভর্তি করে খানা খায় তার ঐ পেট (আল্লাহর কাছে) একটি নিকৃষ্ট পাত্র।" (তিরমিযী : ২৩৮০)

সুন্নাত হল পেটের তিন ভাগের একভাগ খাবার খাবে, আর তিনভাগের একভাগ পানি পান করবে। বাকী এক তৃতীয়াংশ শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য খালী রেখে দিবে। (তিরমিযী : ২৩৮০)

[৫] ইফতারের সময় দু'আ করা

এ মুহূর্তটি জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়ার সময়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ للهِ تَعَالَى عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلّ لَيْلَةٍ لِكُلِّ عَبْدٍ مِنْهُمْ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً

(ক) ইফতারের সময় আল্লাহ রববুল 'আলামীন বহু লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। আর এ মুক্তি দানের পালা রমাযানের প্রতি রাতেই চলতে থাকে। সে সময় সিয়াম পালনকারী প্রত্যেক বান্দার দু'আ কবূল হয়।" (আহমাদ : ৭৪৫০)

(খ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইফতার করতেন তখন বলতেন :

اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

হে আল্লাহ! তোমার জন্য রোযা রেখেছি, আর তোমারই রিযিক দ্বারা ইফতার করছি।

উল্লেখ্য যে, আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী উপরোক্ত হাদীসটিকে দুর্বল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

(ঙ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফতারের সময় নিম্নের এ দুআটি পাঠ করতেন :

ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ

অর্থ : "পিপাসা নিবারিত হল, শিরা উপশিরা সিক্ত হল এবং আল্লাহর ইচ্ছায় পুরস্কারও নির্ধারিত হল।" (আবূ দাউদ : ২৩৫৭, দারাকুতনী : ২২৭৯ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)

ইফতারের সময় যখন আযান হয় তখন আযানের পরের সময়টা দু‘আ কবূলের সময়। হাদীসে আছে আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দু‘আ কবূল হয়।

[৬] বেশি বেশি কুরআন পাঠ করা, সালাত আদায়, যিকর ও দু‘আ করা।

রমযান যেহেতু কুরআন নাযিলের মাস সেহেতু এ মাসে কুরআন তিলাওয়াত ও অধ্যয়ন অন্য সময়ের চেয়ে বেশি করা উচিত।

রাসূলুল্লাহ বলেছেন,

الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ

সিয়াম ও কুরআন কিয়ামতের দিন (আল্লাহর কাছে) মানুষের জন্য এভাবে সুপারিশ করবে যে, সিয়াম বলবে, হে রব! দিনের বেলায় আমি তাকে পানাহার ও যৌন উপভোগ থেকে বিরত রেখেছি। তাই তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবূল কর।

কুরআনও বলবে, হে রব! (রাতে কুরআন পাঠের কারণে) রাতের নিদ্রা থেকে আমি তাকে বিরত রেখেছি। তাই এ পাঠকের ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ মঞ্জুর কর। তিনি বলেন, অতঃপর উভয়েরই সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। (আহমাদ : ৬৫৮৯)

[৭] ইবাদতের তাওফীক কামনা ও আল্লাহর দয়া অনুধাবন করা

আমরা যে ইবাদত করি তাও আল্লাহর দয়া। তিনি যে এ কাজে আমাদেরকে তাওফীক দিয়েছেন সেজন্য আমরা তার শুকরিয়া আদায় করি। অনেকের ভাল কাজও আবার কবূল হয় না। আল্লাহ বলেন :

﴿ ... إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلۡمُتَّقِينَ ٢٧ ﴾ [المائدة: ٢٧]

"কেবলমাত্র মুত্তাকীদের কাজই আল্লাহ কবূল করেন। (মায়িদাহ : ২৭)

ভয় ও আশা নিয়ে যেন আমরা ইবাদত করি। গর্ব-অহঙ্কার ও হিংসা বান্দার ইবাদতকে নষ্ট করে দেয় এবং কুফরী ও শির্ক করলে তার কোন নেকই আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, বরং ইবাদতসমূহ ধ্বংস ও বাতিল হয়ে যায়।

[৮] ইয়াতীম, বিধবা ও গরীব মিসকীনদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া ও বেশি বেশি দান খয়রাত করা।

তাদেরকে যাকাত, ফিত্‌রা ও সাদাকাহ দেয়া। হাদীসে এসেছে :

كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল আর রমাযানে তাঁর এ দানশীলতা আরো বেড়ে যেত। (মুসলিম : ২৩০৮)

[৯] উত্তম চরিত্র গঠনের অনুশীলন করা।

রমযান ধৈর্যধারনের মাস। আর সিয়াম হল এ কার্য প্রশিক্ষণের ইনিষ্টিটিউট। কাজেই এ সময় আমাদেরকে সুন্দর চরিত্র গঠনের অনুশীলন করতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ

'তোমাদের মধ্যে কেউ যদি রোযা রাখে, সে যেন তখন অশ্লীল কাজ ও শোরগোল থেকে বিরত থাকে। রোযা রাখা অবস্থায় কেউ যদি তার

সাথে গালাগালি ও মারামারি করতে আসে সে যেন বলে, “আমি রোযাদার”। (মুসলিম : ১১৫১)

[১০] অপচয় ও অযথা খরচ থেকে বিরত থাকা।

খাওয়া দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আরাম আয়েশে অনেকেই অপচয় ও অপব্যয় করে থাকে। এটা এক গর্হিত কাজ। এ থেকে বিরত থাকা।

[১১] রুটিন করে সময়টাকে কাজে লাগানো।

অহেতুক কথাবার্তা, আড্ডা বাজি, গল্প-গুজব, বেহুদা তর্কবিতর্ক পরিহার করা। রুটিন করে পরিকল্পনা ভিত্তিক কাজ করা। এতে জীবন অধিকতর ফলপ্রসূ হবে।

[১২] দুনিয়াবী ব্যস্ততা কমিয়ে দেয়া।

রমাযানের এ বরকতময় মাসে অর্থ উপার্জন ও ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যস্ততা কমিয়ে দিয়ে আখিরাতের মুনাফা অর্জনের জন্য অধিকতর বেশি সময় দেয়া আবশ্যক। দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী আর আখিরাত চিরস্থায়ী।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿ وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ وَأَبۡقَىٰٓ ١٧ ﴾ [الاعلا: ١٧]

“আর আখিরাতের জীবন সর্বোত্তম এবং চিরস্থায়ী।” (সূরা আ‘লা : ১৭)

[১৩] খাওয়া ও নিদ্রায় ভারসাম্য রক্ষা করা।

কেউ কেউ এতো বেশি খাবার খায় যে নাস্তা ও দুপুরের খাবার শুধু ইফাতের এক বেলায়ই তা পুষিয়ে নেয়। আবার তারাবীহ ও সেহরীর ওয়াক্তের দ্বিগুণ দিনের বেলায় ঘুমিয়ে তা কাযা করে। এভাবে চললে খাবার ও ঘুমের কুরবানী হলো কীভাবে? তাই এ বিষয়ে রোযাদারকে

ত্যাগ তীতিক্ষা করতে হবে এবং এ দু’এর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে সিয়াম পালন করে যেতে হবে।

[১৪] ফজর উদয় হওয়ার পূর্বেই রোযার নিয়ত করা।

[১৫] আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা।

রমাযানের পবিত্র দিন ও রাতগুলোতে ইবাদত করার তাওফীক দেয়ায় মাবুদের প্রশংসা করা।

১০ম অধ্যায়

نية الصوم ووقته وطريقته

সিয়ামের নিয়ত : সময় ও পদ্ধতি

প্রশ্ন ২৮ : ফরয রোযার নিয়ত কখন করতে হয়?

উত্তর : ফজর উদয় হওয়ার আগেই অর্থাৎ রাতের মধ্যেই নিয়ত করে ফেলতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ

১. যে ব্যক্তি ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগেই সিয়াম পালনের নিয়ত করল না তার সিয়াম শুদ্ধ হল না। (আবূ দাউদ : ২৪৫৪)

مَنْ لَمْ يَبِيْتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ

২. যে ব্যক্তি রাতের মধ্যেই সিয়ামের নিয়ত করল না তার সিয়াম শুদ্ধ হল না। (এ নির্দেশ শুধুমাত্র ফরয রোযার ক্ষেত্রে) (নাসাঈ : ৪/১৯৬)

প্রশ্ন ২৯ : নিয়ত কাকে বলে? এটা কীভাবে করব?

উত্তর : নিয়ত হল মনের ইচ্ছা, সঙ্কল্প বা প্রতিজ্ঞা করা। এটা অন্তরের কাজ, মুখে উচ্চারণ করার বিষয় নয়। জিহবার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কোন কাজের প্রারম্ভে মনের মধ্যে যে ইচ্ছা পোষণ করা হয় এটাকেই নিয়ত বলা হয়।

প্রশ্ন ৩০ : কেউ কেউ নিয়ত করার বদলে নিয়ত পড়েন এবং আরবীতে نَوَيْتُ أَنْ أَصُوْمَ غَدًا "নাওয়াইতু আন" বলে আরবীতে নিয়ত শুরু করেন এমন করলে কি সওয়াব বেশি হবে?

উত্তর : নিয়ত কখনই পড়তে বলা হয় নি। করতে বলা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম এবং চার মাযহাবের ইমামগণ কেউই মুখে মুখে নিয়ত পড়েননি। কাজেই যারা নিয়ত পড়েন, মুখে মুখে বলেন এটা শুদ্ধ নয়। আর সওয়াব বেশি হওয়ারতো প্রশ্নই আসে না। করতে নির্দেশ দিয়েছেন পড়তে নয়। কাজেই মুখে মুখে আরবীতে নিয়ত পড়লে এজন্য কোন সওয়াব হবে না।

বিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম বরং এটাকে বিদ্‌আত বলেছেন। বিশুদ্ধ পদ্ধতি হল মনে মনে কল্পনা করে নিয়ত করা।

প্রশ্ন ৩১ : ‘‘নাওয়াইতু আন’’ বলে নিয়ত শুরু করার প্রচলনটা কীভাবে হল?

উত্তর : কারো কারো ধারণা কায়েদা বাগদাদীর লেখক নিজে থেকে বানিয়ে এটা শুরু করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে অন্যান্য বইয়ের লেখকেরা কোন যাচাই বাছাই ছাড়াই তাদের বইগুলোতেও এগুলো নকল করেছেন। এগুলোর কোন অস্তিত্ব বা দলীল কুরআন-হাদীসে কোথাও নেই।

প্রশ্ন ৩২ : রাতের সাহরী খাওয়া নিয়তের জন্য যথেষ্ট হবে কি?

উত্তর : রোযার জন্য নিয়ত করা ফরয। যে ব্যক্তি সিয়াম পালনের জন্য সাহরী খেল- এ সাহরী প্রমাণ করে যে এটা তার শুধুমাত্র সিয়াম পালনের জন্যই খাওয়া হয়েছে। কাজেই এ সাহরী নিয়তের স্থলাভিষিক্ত বলে ধরে নেয়া যায়।

প্রশ্ন ৩৩ : পুরো রমাযানের জন্য শুরুর দিন একবার নিয়ত করে নিলে কি তা যথেষ্ট হবে?

উত্তর : হাঁ, তা হবে। তবে প্রতিদিনই নিয়ত করা মুস্তাহাব বা সুন্নাত।

উল্লেখ্য যে, সাহরী খাওয়া সুন্নাত, কিন্তু নিয়ত করা ফরয।

১১শ অধ্যায়

أقسام الصيام

সিয়ামের প্রকারভেদ

প্রশ্ন ৩৪ : সিয়াম কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর : চার প্রকার। যথা ১. ফরজ, ২. নফল, ৩. মাকরূহ ৪. হারাম।

প্রথমত : ফরয সিয়াম :

(ক) রমযান মাসের সিয়াম

(খ) কাযা সিয়াম

(গ) কাফফারার সিয়াম

(ঘ) মান্নত সিয়াম

দ্বিতীয়ত : নফল সিয়াম

(ক) শাওয়াল মাসের ছয়টি সিয়াম

(খ) যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশকের সিয়াম

(গ) আরাফাতের দিনের সিয়াম

(ঘ) মুহাররম মাসের সিয়াম

(ঙ) আশুরার সিয়াম

(চ) প্রতি চন্দ্রমাসের ১৩. ১৪, ১৫- এ তিন দিনের সিয়াম

(ছ) সাপ্তাহিক সোম ও বৃহস্পতিবারের সিয়াম

(জ) শাবান মাসের সিয়াম

(ঝ) দাঊদ (আঃ)'র সিয়াম

(ঞ) বিবাহে অসামর্থ ব্যক্তিদের সিয়াম।

তৃতীয়ত : মাকরূহ সিয়াম

(ক) হাজ্জ পালনরত অবস্থায় আরাফাতের দিনের সিয়াম

(খ) বিরতীহীনভাবে সিয়াম পালন

(গ) পানাহার বিহীন সিয়াম

(ঘ) কেবলমাত্র জুমুআর দিনের সিয়াম

(ঙ) শুধুমাত্র শনিবারে সিয়াম

চতুর্থত : হারাম সিয়াম :

(ক) দু' ঈদের দিন এবং কুরবানীর ঈদের পরবর্তী ৩ দিন

(খ) সন্দেহ পূর্ণ দিনের (৩০শে শাবান) সিয়াম

(গ) স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রীর নফল সিয়াম

(ঘ) মহিলাদের হায়েয নিফাসকালীন সময়ের সিয়াম

(ঙ) গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় সিয়াম।

১২শ অধ্যায়

مفسدات الصوم

সিয়াম ভঙ্গ হওয়ার কারণসমূহ

প্রশ্ন ৩৫ : কী কী কারণে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যায়?

উত্তর : নিম্নোক্ত যে কোন কারণ দেখা গেলে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে :

১. ইচ্ছা পূর্বক পানাহার ও ধুমপান করা।

২. স্বেচ্ছায় বমি করা

৩. স্বামীস্ত্রীর মিলন

৪. বৈধ অবৈধ যে কোন প্রকার যৌনক্রিয়া।

৫. পানাহারের বিকল্প কিছু গ্রহণ করা, যেমন- ইনজেকশান বা রক্ত গ্রহণ করা। আর তা এমন ইনজেকশান যার মাধ্যমে খাবার সরবরাহ করা হয়।

৬. মাসিক স্রাব ও প্রসবোত্তর স্রাব

প্রশ্ন ৩৬ : কেউ যদি ভুলক্রমে কিছু খেয়ে ফেলে তবে কি তার সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে?

উত্তর : না, ভাঙ্গবে না।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

১. যদি কেউ ভুলক্রমে পানাহার করে তবে সে যেন তার সিয়াম পূর্ণ করে নেয়, কেননা আল্লাহ তা'আলাই তাকে এ পানাহার করিয়েছেন (অর্থাৎ এতে তার রোযা ভাঙ্গেনি)। (বুখারী : ১৯৩৩; মুসলিম : ১১৫৫)

مَنْ أَفْطَرَ فِيْ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلاَ كَفَّارَةَ

২. যে ব্যক্তি ভুল বশতঃ রমাযানের দিনে বেলায় কিছু খেয়ে ফেলল : সেজন্য কোন কাযা ও কাফফারা দিতে হবে না। (দারাকুতনী : ২৪; বায়হাকী : ৭৮৬৩)

প্রশ্ন ৩৭ : অযু গোসলের সময় অসাবধানতা বশতঃ হঠাৎ করে কিছু পানি গলায় ঢুকে গেলে বা জোরপূর্বক খাওয়ানো হলে সিয়াম কি ভঙ্গ হয়ে যাবে?

উত্তর : না, ভঙ্গ হবে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

إِنَّ اللهَ وَضعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوْا عَلَيْهِ

"আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মাতের ভুল-ভ্রান্তি ও বাধ্য হয়ে ঘটে যাওয়া পাপরাশি মাফ করে দিবেন। (ইবন মাজা : ২০৪৫)

প্রশ্ন ৩৮ : সিয়াম অবস্থায় কেউ যদি ইচ্ছাকৃত বমি করে তাহলে তাকে কী করতে হবে?

উত্তর : এ সিয়াম আবার কাযা করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَنْ ذرعه قيء فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءً وإن استقاء فليقض

যে ব্যক্তি অনিচ্ছা বমি করল তাকে উক্ত সিয়াম কাযা করতে হবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বমি করল তাকে উক্ত সিয়াম অবশ্যই কাযা করতে হবে। (আবূ দাঊদ : ২৩৮০)

প্রশ্ন ৩৯ : রমযান মাসে দিনের বেলায় স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে স্বামী-স্ত্রীর মিলন হলে এর হুকুম কি?

উত্তর : এতে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এর ফলে কাযাও করতে হবে এবং কাফফারাও দিতে হবে।

(ক) একদিনের রোযার জন্য একাধারে দু'মাস রোযা রাখতে হবে। মাঝখানে একদিন বাদ গেলে এর পরের দিন থেকে আবার একাধারে পূর্ণ দু' মাস রোযা রাখতে হবে। অথবা

(খ) ষাটজন মিসকিনকে এক বেলা আহার করাতে হবে।

প্রশ্ন ৪০ : উপরোক্ত ঘটনায় কারণে কে কাযা করবে? স্বামী নাকি স্ত্রী?

উত্তর : উভয়েই কাযা করবে এবং কাফফারা দিবে। তবে স্ত্রীকে যদি জোরপূর্বক সঙ্গম করে থাকে তাহলে কাযা ও কাফফারা দিবে শুধু স্বামী, স্ত্রী নয়।

উল্লেখ্য যে, বৈধ ও অবৈধ যে কোন উপায়ে বীর্যপাত ঘটানো হলে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ৪১ : রমযান মাসে রাতের বেলায় কি স্ত্রীসহবাস করা যাবে?

উত্তর : হা, তা জায়েয আছে।

প্রশ্ন ৪২ : কোন প্রকার ইনজেকশানে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে?

উত্তর :

(ক) রক্তশূন্যতা পূরণ জনিত ইনজেকশান

(খ) শক্তি বর্ধক ইনজেকশান

(গ) স্যালাইন ও পানাহারের স্থলাভিষিক্ত ইনজেকশান। এর কোন একটা পুশ করলে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

তবে শুধুমাত্র ঔষধজনিত হলে সিয়াম ভঙ্গ হবে না।

প্রশ্ন ৪৩ : দিবসের কোন অংশে রক্তস্রাব শুরু হলে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে?

উত্তর : দিবসের শুরু বা শেষ যে কোন অংশে স্রাব শুরু হলে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ৪৪ : মাসিক স্রাব শুরু হওয়া অনুভব করছে কিন্তু হয় নি। এ অবস্থায় কি সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে?

উত্তর : শুরু না হওয়া পর্যন্ত ভঙ্গ হবে না।

প্রশ্ন ৪৫ : ঋতুবর্তী মহিলারা কি কাযা করবে?

উত্তর : শুধুমাত্র সিয়াম কাযা করবে। সালাত কাযা করতে হবে না। আয়িশাহ বলেন :

كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ

আমাদেরও এটা ঘটত (অর্থাৎ মাসিক হতো)। তখন আমরা শুধু সিয়াম কাযা করতে আদিষ্ট হতাম। কিন্তু সালাত কাযা করতে আদিষ্ট হতাম না। (মুসলিম : ৩৩৫)

প্রশ্ন ৪৬ : ফাজরের ওয়াক্ত হয়নি মনে করে ফজর শুরু হওয়ার পর পানাহার করল, এমনিভাবে সূর্যাস্ত হয়ে গেছে মনে করে অস্ত যাওয়ার আগেই ইফতার করে ফেলল- এ সিয়াম কি শুদ্ধ হবে?

উত্তর : হা, শুদ্ধ হবে এ জন্য যে, এটি তার অজানা ও অজ্ঞতাবশতঃ হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝٥ ﴾ [الاحزاب: ٥]

'ভুলক্রমে কোনকিছু করে ফেললে এতে কোন গুনাহ হবে না। তবে জেনে শুনে ইচ্ছাকৃত ভাবে কোন অপরাধ করলে অবশ্যই এতে গুনাহ হবে। আল্লাহ তা'আলা অতিশয় ক্ষমাশীল ও মেহেরবান'। (আহযাব : ৫)

প্রশ্ন ৪৭ : সিয়াম অবস্থায় ভুলে পানাহার শুর করে দিল। এমন সময় হঠাৎ স্মরণ হল। এ ব্যক্তি কি করবে?

উত্তর : মনে হওয়ামাত্র মুখের বাকীখানা বা পানীয় ফেলে দেবে আর যতটুকু ভুলে খাওয়া হয়ে গেছে সেজন্য সিয়াম ভঙ্গ হবে না। তবে এ দৃশ্য যে দেখবে তার উপর ফরয হল সিয়াম পালনকারীকে স্মরণ করিয়ে দেয়া।

প্রশ্ন ৪৮ : কেউ যদি কোন সিয়ামকারীকে জবরদস্তি করে কোন কিছু খাওয়ায় তাহলে কি হবে?

উত্তর : এতে সিয়াম ভঙ্গ হবে না। অনুরূপভাবে জোর করে কোন মুমিনকে কাফির বানাতে চাইলে সে কাফির হবে না।

অনুরূপভাবে স্ত্রীর সম্মতি ব্যতিরেকে স্ত্রীকে জোর করে সঙ্গম করলে স্ত্রীর সিয়াম ভাঙ্গবে না কিন্তু স্বামীর সিয়াম অবশ্যই ভেঙ্গে যাবে।

প্রশ্ন ৪৯ : বিনা উযরে যে ইচ্ছা করে অতীতের সিয়াম ভঙ্গ করেছে তার কি করতে হবে?

উত্তর : এটি একটি মহাপাপ। তাকে তাওবা করতে হবে এবং এসব রোযা কাযা করতে হবে।

প্রশ্ন ৫০ : দিনের বেলায় ঘুমন্ত অবস্থায় যদি স্বপ্নদোষ হয়ে যায় তাহলে কি হবে?

উত্তর : এতে রোযা ভাঙ্গবে না। কারণ স্বপ্নদোষ নিজের ইচ্ছাকৃত কোন ঘটনা নয়।

প্রশ্ন ৫১ : সিয়াম অবস্থায় থুথু কাশি গিলে ফেলা কেমন?

উত্তর : মুখে থাকা থুথু গিলে ফেললে অসুবিধা নেই। তবে কাশি গিলে ফেলা জায়েয নয়। কেননা কাশি থুথুর মত নয়।

প্রশ্ন ৫২ : নাক দিয়ে রক্ত পড়লে কিংবা দাঁত উঠলে অথবা আহত হয়ে রক্ত প্রবাহিত হলে কি সিয়ামের কোন ক্ষতি হবে?

উত্তর : না, এতে সিয়াম ভাঙ্গবে না। কোন ক্ষতিও হবে না।

প্রশ্ন ৫৩ : কোন রোযাদার ব্যক্তি তার সিয়াম ভঙ্গ করার নিয়ত করল কিন্তু সে তখনো কোন খানাপিনা খায়নি- তার সিয়াম কি ঠিক আছে, নাকি ভেঙ্গে গেছে?

উত্তর : তার সিয়াম ভঙ্গ হয়ে গেছে। কারণ সিয়ামের জন্য নিয়ত ফরয। আর এ ফরয তার তরক হয়ে গেছে। কাজেই রোযা তার ভেঙ্গে গেছে খাবার বা পানীয় গ্রহণ ছাড়াই।

১৩শ অধ্যায়

مكروهات الصوم

যেসব কারণে সওম মাকরূহ হয়ে যায়

প্রশ্ন ৫৪ : সওম মাকরূহ হওয়ার অর্থ কি?

উত্তর : মাকরূহ শব্দের অর্থ অপছন্দনীয়। আর সওমের মাকরূহ হল সিয়াম পালন অবস্থায় যেসব কাজ করা অপছন্দনীয়। এ জাতীয় কাজ সিয়াম ভঙ্গ করে না কিন্তু এসব চর্চা করা কখনো কখনো সিয়াম বিনষ্টের কাছাকাছি নিয়ে যায়। এসব কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকা উচিত।

প্রশ্ন ৫৫ : কী কী কারণে সিয়াম মাকরূহ হয়?

উত্তর : সিয়াম অবস্থায় নিম্ন বর্ণিত যে কোন কাজ করলে সিয়াম মাকরূহ হয়ে যায় :

(১) অযুর সময় গড়গড়া করে কুলি করা, জোড় দিয়ে নাকে পানি টানা। এতে গলা বা নাক দিয়ে ভিতরে পানি প্রবেশ করার সম্ভাবনা থেকে যায়।

(২) বিনা প্রয়োজনে খাদ্যের স্বাদ দেখা। তবে প্রয়োজন হলে দেখতে পারে।

(৩) থুথু কফ মুখে জমিয়ে গিলে ফেলা। অল্প অল্প থুথু গিলে ফেললে কোন অসুবিধা নেই।

(৪) যৌন অনুভূতি নিয়ে স্ত্রীকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করা, বারবার তার দিকে তাকানো, বারবার সহবাসের কল্পনা করা। কারণ এসব কার্যক্রমে বীর্যপাত ঘটা বা সহবাসে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

প্রশ্ন ৫৬ : বিনা প্রয়োজনে যদি কোন মহিলা স্বীয় বাচ্চাকে রোযা অবস্থায় খাদ্য চিবিয়ে দেয় তবে তার হুকুম কী?

উ: রোযা মাকরূহ হবে অর্থাৎ অন্য লোকে যদি খাদ্য চিবিয়ে দেয়ার মতো থাকে বা অন্য কোন উপায়ে যদি শিশুকে খাদ্য চিবিয়ে দেয়া যায়, তাহলে রোযাদার মহিলার জন্য চিবিয়ে দেয়া মাকরূহ হবে।

বি: দ্র:- প্রয়োজনবশত: চিবিয়ে দিলে তা মাকরূহ হবে না বরং চিবিয়ে দেয়ার সময় সতর্ক থাকতে হবে যাতে পেটে খাদ্যের কিছু অংশ চলে না যায়।

১৪শ অধ্যায়

مباحات الصيام

সিয়াম অবস্থায় যেসব কাজ মুবাহ অর্থাৎ বৈধ

প্রশ্ন ৫৭ : কী কী কাজ করলে সিয়াম ভঙ্গ হয় না? অথবা সিয়াম অবস্থায় কী কী কাজ বৈধ?

উত্তর : সিয়াম অবস্থায় নিম্নোক্ত কাজ করলে সিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না :

[১] শুধুমাত্র রোগ আরোগ্যের জন্য যে ইনজেকশান দেয়া হয়।

[২] কুলি করা, নাকে পানি দেয়া। তবে গড়্গড়া করবে না। নাকের খুব ভিতরে পানি টান দিয়ে নেবে না।

[৩] মিসওয়াক করা, মাজন ও টুথপেস্ট ব্যবহার করতে পারবে। তবে গলার ভিতর যাতে না ঢুকে সে জন্য সতর্ক থাকতে হবে।

[৪] গরম থেকে বাঁচার জন্য মাথায় শীতল পানি দেয়া, গোসল করা, ভিজা কাপড় গায়ে জড়িয়ে রাখা।

[৫] জিহবা দিয়ে খাদ্য বা তরী-তরকারীর স্বাদ দেখা।

[৬] সুরমা ব্যবহার, চোখে বা কানে ঔষধ ব্যবহার।

[৭] স্ত্রীকে স্পর্শ করা।

[৮] রাত্রিবেলায় স্ত্রী সহবাস করা।

[৯] কোন কিছুর ঘ্রাণ নেয়া। তবে ধুমপান, আগরবাতি ও চন্দন কাঠের ধোঁয়া বা ধুপ গ্রহণ করবে না।

[১০] সিংগা লাগানো।

উপরোক্ত কয়েকটি বিষয়ে দলীল নিম্নে দেয়া হল :

بَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

(ক) সিয়াম অবস্থায় না থাকলে অযুর সময় নাকের ভিতর উত্তমরূপে পানি টেনে নেবে। (তিরমিযী : ৭৮৮)

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ

(খ) আমার উম্মতের কষ্টবোধ হবে এ আশঙ্কা না থাকলে প্রত্যেক অযুর সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। (বুখারী : ৭২৪০)

كان رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ صَائِمٌ مِنْ الْعَطَشِ أَوْ مِنْ الْحَرِّ

(গ) সিয়াম অবস্থায় তাপ বা পিপাসার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মাথায় পানি ঢালতেন। (আবূ দাউদ : ২৩৬৫)

لاَ بَأْسَ أَن يَّذُوْقَ الْخَلَّ أَوِ الشَّيْءَ مَالَمْ يَدْخُلْ حَلْقِهِ وَهُوَ صَائِمٌ

(ঘ) গলার ভিতর প্রবেশ না করলে সিয়াম অবস্থায় তরকারী বা খাদ্যের স্বাদ দেখতে কোন অসুবিধা নেই। (বুখারী : ৯২৭৭)

لَمْ يَرَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيْمُ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, হাসান ও ইবরাহীম (রহ.) সিয়াম পালনকারীদের জন্য সুরমা ব্যবহার কোনরূপ অসুবিধা মনে করতেন না। (বুখারী : ১৯২৯)

كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنْ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ

(ঙ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিয়াম অবস্থায় (স্ত্রী) চুম্বন করতেন, শরীরে শরীর স্পর্শ করতেন। কেননা, তিনি তার প্রবৃত্তির (যৌন চাহিদা) উপর তোমাদের চেয়ে অধিক নিয়ন্ত্রক ছিলেন। (বুখারী : ১৯২৭)

أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

(চ) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিয়াম অবস্থায় নিজের শরীরে শিঙ্গা লাগিয়েছেন। (বুখারী : ১৯৩৮)

أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ

(ছ) বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে সহবাস করে ফজর পর্যন্ত কাটিয়েছেন। অতঃপর গোসল করে ফজরের সালাত আদায় করছেন। (বুখারী : ১৯২৬; মুসলিম : ১১০৯)

প্রশ্ন ৫৮ : কিডনী পরিষ্কার করলে, চোখে বা কানে ড্রপ দিলে, দাঁত উঠলে, ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ লাগালে, রক্ত পরীক্ষা করার জন্য রক্ত নিলে রোযা কি ভেঙ্গে যাবে বা ক্ষতি হবে?

উত্তর : না, এতে রোযা ভাঙ্গবেও না ক্ষতিও হবে না।

প্রশ্ন ৫৯ : যদি সুবহে সাদেক হয়ে যায় বা ফজরের আযান শুরু হয়ে যায় আর মুখে খাবার বা পানীয় থাকে তাহলে কি করবে?

উত্তর : মুখে যেটুকু খাবার বা পানি আছে তা ফেলে দেবে। ফলে তার রোযা শুদ্ধ হয়ে যাবে। এটা ফকীহদের ঐক্যমতের রায়।

প্রশ্ন ৬০ : রোযাদার যদি আহত হয় বা নাক দিয়ে রক্ত ঝরে কিংবা কোন কারণে অনিচ্ছাকৃতভাবে গলায় পানি বা তেল ঢুকে যায় তাহলে রোযার কি হবে?

উত্তর : এতে রোযা নষ্ট হবে না।

প্রশ্ন ৬১ : চোখের অশ্রু যদি গলায় প্রবেশ করে তাহলে কি রোযা ভেঙ্গে যাবে?

উত্তর : না, এতে রোযা ভাঙ্গবে না।

প্রশ্ন ৬২ : রোযাদার ব্যক্তি যদি আতরের গন্ধ, চন্দন কাঠ বা আগরবাতির ঘ্রাণ শুঁকে তাহলে কি হবে?

উত্তর : এতে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। তবে ধোঁয়া যাতে গলায় প্রবেশ না করে সে ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে।

আরো যে সব কারণে রোযা ভঙ্গ হয়না তা হল :

১। ভুলক্রমে কোন কিছু পানাহার করলে ২। ভুলক্রমে যৌনসম্ভোগ করলে ৩। স্বপ্নদোষ হলে ৪। স্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাতের দরুন বীর্যপাত হলে ৫। তেল মালিশ করলে ৬। শিঙ্গা লাগালে ৭। সুরমা লাগালে ৮। স্ত্রীকে চুম্বন করলে ৯। আপনা আপনি বমি হলে ১০। মূত্রণালীতে ঔষধ দিলে ১১। কানে পানি গেলে, ১২। ধূলা প্রবেশ করলে।

১৫শ অধ্যায়

أحكام القضاء والكفارة

সিয়ামের কাযা ও কাফফারার বিধান

প্রশ্ন ৬৩ : সিয়ামের কাযা ও কাফফারা কী জিনিস? এগুলো কীভাবে আদায় করতে হয়?

উত্তর : অনিচ্ছাকৃত বা উযরবশত ছুটে যাওয়া সাওমের বদলে কাযা, আর উযরছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেয়া সাওমের বদলে দিতে হয় কাফফারা। কাযা হলে সম পরিমাণ সাওম আদায় করতে হয়। আর কাফ্ফারা হলে, সাওম না রাখার কারণে সুনির্দিষ্ট কিছু কর্তব্য পালন করতে হয়। কাফফারা তিন ধরনের। (১) গোলাম আযাদ করা, আর তা সম্ভব না হলে (২) একাধারে ৬০টি রোযা রাখা, আর সেটিও সম্ভব না হলে (৩) ৬০ জন মিসকীনকে এক বেলা খানা খাওয়ানো।

প্রশ্ন ৬৪ : যে ব্যক্তি বিনা উযরে বিনা করণে অতীতে সিয়াম ভঙ্গ করেছে সে কীভাবে কাযা ও কাফফারা আদায় করবে?

উত্তর : এক রমযানের সাওম তাকে পরবর্তী রমযানের আগে আদায় করতে হবে। যদি তা সম্ভব না হয় তবে সারা জীবনে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা কাযা করে নিতে হবে। এবং প্রতি রোযার বদলে একটি রোযা পালন করতে হবে। আর তা রাখতে শারীরিকভাবে অক্ষম হলে একজন মিসকীনকে এক বেলা খানা খাওয়াতে হবে।

প্রশ্ন ৬৫ : দিনের বেলায় সহবাসের কারণে সিয়াম ভঙ্গ হলে তার কি করতে হবে।

উত্তর : এজন্য তাকে কাযাও করতে হবে এবং কাফফারাও দিতে হবে। এ দু'টিই তার জন্য ফরয? সহবাসের কারণে যে রোযা ভঙ্গ হয় ঐ

একটা রোযার বদলে একাধারে ষাট দিন রোযা রাখতে হবে। এবং এর মাঝখানে সঙ্গত কারণ ছাড়া কোন বিরতি দেয়া যাবে না।

যদি মাঝখানে বিরতি দেয়া হয় তাহলে এরপর থেকে আবার নতূন করে ষাট দিন বিরতীহীনভাবে সিয়াম পালন করতে হবে।

প্রশ্ন ৬৬ : একটি রোযা ভাঙ্গার কারণে ষাটটি রোযা রাখা, তাও আবার বিরতীহীনভাবে এভাবে আদায় করতে যদি কেউ অক্ষম বা অপারগ হয় তাহলে কি করবে?

উত্তর : ৬০ জন অভাবী মানুষকে একবেলা খানা খাওয়াবে। প্রতিজনের খাবারের পরিমাণ হবে কমপেক্ষ ৫১০ গ্রাম।

প্রশ্ন ৬৭ : কাউকে চুমু দেয়ার কারণে বা স্ত্রী বা কোন মেয়ের গা স্পর্শ হওয়ার কারণে অনিচ্ছিকৃতভাবে বীর্যপাত হয়ে গেলে ঐ দিনের সিয়াম কীভাবে কাযা করবে?

উত্তর : সাধারণ নিয়মেই এক সাওমের বিপরীতে এক সাওম হিসেবে কাযা করবে

প্রশ্ন ৬৮ : কোন্ কারণে রোযা ভঙ্গ হলে কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হয়?

উ: রোযাবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে সহবাস করলে কাযা ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে ১টি রোযা কাযা করবে, অতঃপর ৬০টি রোযা কাফফারা হিসেবে আদায় করবে। অর্থাৎ ১ রোযার বদলে বিরতিহীনভাবে মোট ৬১টি রোযা পালন করবে।

প্রশ্ন ৬৯ : ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে কী করবে, কাযা না কাফফারা?

উ: অধিকাংশ আলেমদের মতে শুধু কাযা করবে। অর্থাৎ এক রোযার বদলে একটি রোযা পালন করবে। তবে কোন কোন আলেমের মতে কাযা ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হয়ে যাবে। অর্থাৎ ১ রোযার বদলে বিরতিহীনভাবে মোট ৬১টি রোযা পালন করবে।

প্রশ্ন ৭০ : কোন কোন কারণে রোযা ভঙ্গ হলে শুধু কাযা ওয়াজিব হয়?

উ: ১। স্ত্রীকে চুম্বন/স্পর্শ করার কারণে বীর্যপাত ঘটলে। ২। ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভরে বমি করলে ৩। পাথর, লোহার, টুকরা, ফলের আঁটি ইত্যাদি গিলে ফেললে ৪। ভুলক্রমে কিছু খেতে আরম্ভ করে রোযা ভঙ্গ হয়েছে মনে করে পুনরায় আহার করলে। ৫। কুলি করার করার সময় পেটে পানি চলে গেলে ৬। মুখে বমি এলে পুনরায় তা পেটে প্রবেশ করালে ৭। দাঁতের ফাঁক থেকে খাদ্য কণা খেয়ে ফেললে ৮। রোযার নিয়ত না করে ভুল করে রোযা ভঙ্গ হয়ে গেছে মনে করে পানাহার করলে।

প্রশ্ন ৭১ : রমযানের রোযা কাযা করার হুকুম কি? কেউ যদি একাধিক রোযা ভঙ্গ করে তবে সে কি এগুলো একাধারে কাযা করবে?

উ: ধারাবাহিকভাবে কাযা করা মুস্তাহাব। তবে পৃথক পৃথকভাবে কাযা করা জায়েয আছে। কাযাকারী পরবর্তী রমজান আসার পূর্বে করা উত্তম। তবে যে কোন সময়ে তা করতে পারবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٤]

“অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করে নেবে। (বাকারা : ১৮৪)

প্রশ্ন ৭২ : এক রমযানের কাযা আদায়ের পূর্বে অন্য রমযান আগমন করলে কী করবে?

উ: এমতাবস্থায় চলতি রমযানের রোযা আদায় করার পর পূর্বের রোযাগুলোর কাযা পালন করবে।

১৬শ অধ্যায়

অসুস্থ ব্যক্তির সিয়াম

প্রশ্ন ৭৩ : কী পরিমাণ অসুস্থ হলে সিয়াম ভঙ্গ করতে হবে?

উত্তর : রোগের কারণে যদি স্বাভাবিক সুস্থতা হারিয়ে ফেলে, ডাক্তার যদি বলে যে, এ সিয়ামের কারণে রোগের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে, বা রোগীর ক্ষতি হতে পারে বা সুস্থতা বিলম্বিত হতে পারে তবেই রোযা ভাঙ্গবে। কিন্তু সামান্য অসুখ যেমন মাথা ব্যাথা, শর্দি, কাশি অনুরূপ কোন সাধারণ রোগ বালাইয়ের কারণে সিয়াম ভঙ্গ করা জায়েয হবে না। মনে রাখতে হবে যে, রোগের কারণে যেসব সিয়াম ভঙ্গ হবে ঠিক অনুরূপ সংখ্যক সিয়াম পরে কাযা করতে হবে।

প্রশ্ন ৭৪ : অসুস্থ হলেও সিয়াম পালনে খুব কষ্ট হচ্ছে না এবং কোনরূপ ক্ষতির আশঙ্কাও নেই এমতাবস্থায় কি করব?

উত্তর : সিয়াম পালন করবে। এমন হলে ভঙ্গ করা জায়েয হবে না।

প্রশ্ন ৭৫ : সিয়াম পালনে কষ্ট হচ্ছে কিন্তু রোগীর কোন ক্ষতির আশঙ্কা নেই- কি করবে?

উত্তর : এ রোগী সিয়াম ভেঙ্গে ফেলবে। কারণ আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দার প্রতি অতিশয় দয়ালু। অবশ্য পরে এটা কাযা করে নেবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ ١٨٥ ﴾ [البقرة: ١٨٥]

“কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ (রমযান) মাস পাবে, সে যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে আর যে পীড়িত কিংবা সফরে আছে, সে

অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করবে, আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান, যা কষ্টদায়ক তা চান না যেন তোমরা মেয়াদ পূর্ণ করতে পার। (বাকারা : ১৮৫)

প্রশ্ন ৭৬ : সিয়াম পালনে রোগীর কষ্ট হচ্ছে, তবু সে সিয়াম ভঙ্গ করতে রাজী নয়- এর হুকুম কি?

উত্তর : এ রোগীর রোযা পালন সঠিক নয়, বরং মাকরূহ। কারণ সে আল্লাহর দেয়া সুবিধা গ্রহণ না করে বরং নিজেকে শাস্তি দিচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصَهُ كَمَا يَكْرِهُ أَنْ تُؤْتَى مَعَاصِيْهِ

আল্লাহর অবাধ্য হওয়াকে মাবুদ যেমন অপছন্দ করেন, তার দেয়া সুবিধাদি গ্রহণ করাকেও তিনি তেমন পছন্দ করেন। (আহমাদ : ২/১০৮)

প্রশ্ন ৭৭ : সিয়াম পালনে রোগ বৃদ্ধি পাবে এবং ক্ষতিও হবে। তবু পরহেজগারী মনে করে সিয়াম পালন করে যাওয়া কেমন?

উত্তর : অবস্থা এমন হলে সিয়াম চালিয়ে যাওয়া কোন পরহেজগারী কাজ নয়। বরং এ অবস্থায় সিয়াম পালন করা নিষেধ এবং সওম ভঙ্গ করা জরুরী। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ ... وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩ ﴾ [النساء: ٢٩]

তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি অতিশয় দয়ালু। (সূরা নিসা : ২৯)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

“তোমার উপর তোমার আত্মার হক রয়েছে।” (আবূ দাঊদ : ১৩৬৯ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)

নিজের বা অন্যের কারোরই ক্ষতি করার কোন অধিকার মানুষের নেই।

প্রশ্ন ৭৮ : কোন সুস্থ ব্যক্তি দিনের কোন অংশে অসুস্থ হয়ে পড়ল, বাকী অংশ সিয়াম পালনে কষ্ট হচ্ছে- কী করবে?

উত্তর : সিয়াম ভঙ্গ করে ফেলবে এবং পরে কাযা করে নেবে।

প্রশ্ন ৭৯ : কোন রোগী দিনের মধ্যভাগে সুস্থ হয়ে গেল, সেকি দিনের বাকী অংশ সিয়াম পালন করবে?

উত্তর : না, কারণ দিনের শুরুতে যেহেতু সিয়াম ছিল না কাজেই দিনের বাকী অংশে খানা-পিনা ত্যাগের দরকার নেই।

ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ে এবং জীবন নাশের আশঙ্কা করে তবে কী করবে?

উত্তর : রোযা ভঙ্গ করবে এবং পরে এটা কাযা করবে।

প্রশ্ন ৮০ : রোযা অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে গেলে কী করবে?

উত্তর : রোযা ভেঙ্গে ফেলবে এবং পরে তা কাযা করবে।

প্রশ্ন ৮১ : কোন রোগী সুস্থ হওয়ার পর কাযা আদায় করার আগেই মৃত্যুবরণ করল তার জন্য কী করতে হবে?

উত্তর : তার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে প্রতি একদিনের রোযার বদলে একজন মিসকিনকে একবেলা খানা খাওয়াবে। অথবা তার কোন আত্মীয় যদি তারপক্ষ থেকে কাযা আদায় করে তবে মাইয়্যেতের জন্য তা আদায় হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ৮২ : কোন অসুস্থ ব্যক্তির কাযা রোযা সুস্থ হওয়ার পর কাযা না করে শুধু ফিদইয়া দিলে কি চলবে?

উত্তর : না, তা জায়েয হবে না। কাযা করতে হবে।

প্রশ্ন ৮৩ : কঠিন শারীরিক পরিশ্রম যারা করে তারা কি রমযানের ফরয রোযা ভাঙ্গতে পারবে?

উত্তর : না, পারবে না।

৮৪ প্রশ্ন : পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যয়নের চাপের কারণে রোযা কি ভাঙ্গতে পারবে?

উত্তর : না, তাও পারবে না। অধ্যয়ন রোযা ভঙ্গের উযর হিসেবে গণ্য হবে না।

১৭শ অধ্যায়

অতি বৃদ্ধ, অচল ও চিররোগীদের সিয়াম

প্রশ্ন ৮৫ : খুবই বৃদ্ধ লোক। সিয়াম পালন তার জন্য খুবই কষ্টকর। তার সিয়াম পালনের কি হুকুম?

উত্তর : তার উপর সিয়াম পালন জরুরী নয়। তবে এ ব্যক্তি অন্য কাউকে দিয়ে কাযা আদায় করাবে অথবা ফিদইয়া দিবে। প্রতি এক রোযার জন্য একজন মিসকিনকে এক বেলা খাবার খাওয়াবে। (পরিমাণ ৫১০ গ্রাম পরিমাণ ভাল খাবার)

﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: ١٨٤]

অর্থাৎ "শক্তিহীনদের উপর কর্তব্য হচ্ছে ফিদ্‌য়া প্রদান করা, এটা একজন মিসকীনকে অন্নদান করা।" (আল-বাকারা : ১৮৪)

প্রশ্ন ৮৬ : এমন চিররোগী যার আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা নেই। যেমন- ক্যান্সার বা এ ধরণের কোন রোগ। এসব লোকের সিয়াম পালনের হুকুম কি?

উত্তর : এ ধরণের চির রোগীদের উপর সিয়াম ফরয নয়। তবে তাদেরকে পূর্বের নিয়মে ফিদইয়া দিতে হবে। আর রোযার ফিদইয়া হলো মিসকীনকে খাবার খাওয়ানো।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ... ﴾ [التغابن: ١٦]

[১] তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় করে চলো। (তাগাবুন : ১৬)

﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَاۚ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]

[২] সাধ্যের বাইরে কোনকিছু আল্লাহ কারোর উপর চাপিয়ে দেন না। (বাকারাহ : ২৮৬)

প্রশ্ন ৮৭ : এমন বৃদ্ধলোক যে ভাল মন্দ পার্থক্য করতে পারে না। বিবেক বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। তার সিয়ামের হুকুম কি?

উত্তর : এমন বৃদ্ধলোকের উপর সিয়াম ফরয নয়। তাদের কাযা ও কাফফারা কিছুই নেই।

প্রশ্ন ৮৮ : পূর্বোক্ত বৃদ্ধলোকের যদি কখনো কখনো হুশ ফিরে আসে, জ্ঞান ফিরে পায় তাহলে কি করবে?

উত্তর : তাহলে হুশ অবস্থায় সিয়াম পালন করবে, সালাতও আদায় করবে, সিয়াম সালাত তখন ফরয হয়ে যাবে।

১৮শ অধ্যায়

মুসাফিরের সিয়াম

প্রশ্ন ৮৯ : মুসাফির কাকে বলে?

উত্তর : যে ব্যক্তি ভ্রমণ বা সফর করে তাকে সফররত অবস্থায় মুসাফির বলে। আবার যখন নিজ বাড়ী বা বাসভবনে চলে আসে তখন শরীয়াতের পরিভাষায় তাকে বলে মুকীম। মুকীম অর্থ হলো নিজ বাসস্থানে অবস্থানকারী ব্যক্তি অর্থাৎ মুসাফির নন।

পশ্ন ৯০। কমপক্ষে কী পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করলে অর্থাৎ সফর করলে একজন ভ্রমণকারী বা যাত্রীকে মুসাফির বলা যায়?

উত্তর : হানাফী মাযহাবে কমপক্ষে ৪৮ মাইল। অন্যান্য মাযহাবে সফরের নিম্নতম দূরত্ব আরো কম।

প্রশ্ন ৯১ : মুসাফির অবস্থায় সিয়াম ও সালাতের নিয়ম কি?

উত্তর : মুসাফির অবস্থায় সিয়াম ভঙ্গ করা জায়েয এবং চার রাকআত বিশিষ্ট ফরয সালাতগুলো ২ রাকআত করে পড়বে। সে সময় ফরয নামাযের আগে বা পরে যে সমস্ত সুন্নাতে রাতেবাহ আছে সেগুলো পড়তে হবে না।

প্রশ্ন ৯২ : সফরে থাকা অবস্থায় সিয়াম ভঙ্গ করা জায়েয এ নিয়তে রোযার মাসে সফরে বের হওয়া কি বৈধ হবে?

উত্তর : এ নিয়তে সফরে বের হলে সিয়াম ভঙ্গ করা হারাম।

প্রশ্ন ৯৩ : কোন ধরণের ভ্রমণে সিয়াম ভঙ্গ করা যাবে?

উত্তর : হজ্জ, উমরা, জিহাদ, পড়াশুনা, ব্যবসা, বেড়ানো, পর্যটন ইত্যাদি। তবে অধিকাংশ সত্যনিষ্ঠ আলেমদের মতে অন্যায় ও অবৈধ কাজের সফরে সিয়াম ভঙ্গ করা হারাম।

প্রশ্ন ৯৪ : মুসাফিরের রোযা ভঙ্গ করলে পরবর্তীকালে তা কাযা করবে কি না?

উ: হ্যাঁ, কাযা করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٤]

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ কিংবা মুসাফির সে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করে (কাযা করে) নিবে। (বাকারা : ১৮৪)

প্রশ্ন ৯৫ : সফরে সিয়াম ভঙ্গ করা কি বাধ্যতামূলক নাকি ইচ্ছাধীন?

উত্তর : ইচ্ছাধীন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

صُمْ إِنْ شِئْتَ وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ

"ইচ্ছা করলে সিয়াম পালন কর এবং চাইলে ভেঙ্গেও ফেলতে পার।" (মুসলিম : ১১২১)

প্রশ্ন ৯৬ : সফরে সিয়াম পালন করা উত্তম না ভঙ্গ করা উত্তম।

উত্তর : মুসাফিরের জন্য যেটা সহজ সেটাই উত্তম। সফররত অবস্থায় সিয়াম পালন যদি কষ্টকর হয়ে যায় তাহলে ভেঙ্গে ফেলাই উত্তম। অতি বেশি কষ্টকরে সিয়াম পালন করা ঠিক নয়।

(ক) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]

“আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান, কঠিন চান না।” (বাকারাহ : ১৮৫)

(খ) মাক্কাহ বিজয়ের বৎসর মাক্কার উদ্দেশ্যে কুরা আলগামীম নামক স্থানে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের সামনে আসর বাদ সিয়াম ভঙ্গ করে পানি পান করলেন। (মুসলিম : ১১১৪)

(গ) জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু’র এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, সফরে কষ্ট হওয়ার পর ও একদল লোক সিয়াম পালন করেই যাচ্ছে। বিষয়টি জানার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

أُولَئِكَ الْعَصَاةُ أُولَئِكَ الْعَصَاةُ

“তারা পাপী তারা পাপী।” (মুসলিম : ১১১৪)

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সফররত অবস্থায়- অতিমাত্রায় কষ্ট করে সিয়াম পালন করা পরহেজগারীর কাজ নয়, বরং এটা পাপের কাজ।

(ঘ) একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজায়গায় কিছু মানুষের ভীড় দেখে এগিয়ে দেখলেন যে, এক লোককে ছায়া দেয়া হচ্ছে। তিনি বলেলেন, সে কে? লোকেরা বলল, এ ব্যক্তি রোযাদার। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ اَلصِّيَامُ فِي السَّفَرِ

“সফরে সিয়াম পালন করা ভালকাজ নয়। (বুখারী : ১৯৪৬; মুসলিম : ১১১৫)

এসব দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, সফর কষ্টকর হলে রোযা না রাখাই শ্রেয়। আর ভ্রমণ যদি খুব বেশি কষ্টের না হয় তাহলে সিয়াম পালন করাই উত্তম।

প্রশ্ন ৯৭ : সফরে সবল ও দুর্বল ব্যক্তির সিয়ামের হুকুম কি?

উত্তর : সবল হলে পালন করা এবং দুর্বল হলে ভেঙ্গে ফেলা উত্তম।

প্রশ্ন ৯৮ : সফর যদি বাড়ীতে থাকার মতই আরামদায়ক হয় তাহলে সিয়াম কি করবে?

উত্তর : সেক্ষেত্রে সিয়াম পালনই উত্তম। কারণ এতে অতিদ্রুত দায়িত্বমুক্ত হওয়া যায়, সকলের সাথে সিয়াম পালন হয় এবং মাসটাও থাকে ফযীলাতপূর্ণ।

প্রশ্ন ৯৯ : মুসাফির কখন তার সিয়াম ভঙ্গ করবে?

উত্তর : তার গ্রাম বা মহল্লা থেকে বের হওয়ার আগে নয়। সিয়াম ভঙ্গ করতে হলে তার এলাকা থেকে বের হওয়ার পর ভঙ্গ করবে।

প্রশ্ন ১০০ : সূর্যাস্তের পর ইফতারী করে বিমানে আকাশে উঠে দেখল সূর্য দেখা যায়- সে কি করবে?

উত্তর : তার রোযা হয়ে গেছে। কাযা করার কোন কারণ নেই।

প্রশ্ন ১০১ : এক ব্যক্তি মুকীম অবস্থায় রোযা রাখল। অতঃপর দিনের বেলায় সফর শুরু করল। সে কি করবে?

উত্তর : ইচ্ছা করলে রোযা ভঙ্গতে পারবে।

প্রশ্ন ১০২ : সফরই যাদের চাকুরী যেমন ডাক বিভাগের কর্মচারী; বাস ও ট্রেনের ড্রাইভার, বিমানের পাইলট ও জাহাজের নাবিক তারা কি করবে?

উত্তর : তারা রোযা ভঙ্গ করতে পারবে। তবে তাদেরকে পরে অবশ্যই কাযা আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন ১০৩ : কেউ যদি এক দেশে রোযা রাখে অতঃপর ভিন্ন রাষ্ট্রে চলে যায় তাহলে রোযা শুরু বা শেষ কোন দেশের সময় অনুযায়ী করবে?

উত্তর : যখন যে দেশে অবস্থান করবে সে দেশের লোকদের সাথে ঐ দেশের সময় অনুযায়ী রোযা রাখবে ও ঈদ পালন করবে। তারপর যদি রোযার সংখ্যা ২৯ এর কম হয় তবে ঈদের পরে ১দি কাযা করবে।

প্রশ্ন ১০৪ : অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয়ে এবং মুসাফির মুকীম হয়ে কিছুদিন অবস্থান করার পর মারা গেলে তাদের কাযার ফায়সালা কি?

উ: সুস্থ এবং মুকীম অবস্থায় যে কয়দিন জীবিত ছিল সে কয়দিনের রোযার কাযা ওয়াজিব হবে। যেমন কোন রুগ্ন ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় ১০টি রোযা ছেড়ে দিল এবং সুস্থ হয়ে ৫দিন অবস্থানের পর মারা গেল উক্ত ব্যক্তির উপর ৫দিনের ৫টি রোযার কাযা ওয়াজিব হবে। অতএব, উক্ত দিনের রোযা না রাখলে ফিদইয়াহ আদায়ের জন্য অসিয়ত করলে মৃত ব্যক্তির মাল হতে ফিদইয়াহ আদায় করা ওয়াজিব। কিন্তু অসিয়ত না করলে ওয়াজিব হবে না বরং মুস্তাহাব হবে।

১৯শ অধ্যায়

গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী নারীদের সিয়াম

প্রশ্ন ১০৫ : গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী নারীরা কি সিয়াম পালন করবে নাকি ভঙ্গ করবে?

উত্তর : গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারীণী সিয়াম পালন করলে নিজের বা সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কা **থাকুক বা না থাকুক উভয়** অবস্থায় তাদের সিয়াম ভঙ্গ করা জায়েজ আছে এবং পরে তা কাযা করে নেবে। পরে করলে তারা সিয়াম পালনও করতে পারে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ وَعَنْ الْحَامِلِ أَوْ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوْ الصِّيَامَ

"আল্লাহ রববুল 'আলামীন মুসাফিরদের সালাত অর্ধেক কমিয়ে দিয়েছেন এবং গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী নারীদের সিয়াম না রেখে পরে আদায় করার অবকাশ দিয়েছেন। (তিরমিযী : ৭১৫)

তাদের বিষয়টি সাধারণ রোগী ও মুসাফিরের সিয়ামের মাসআলার অনুরূপ।

তাছাড়া মহিলা শারীরিকভবে যদি শক্তিশালী হয় এবং সন্তানের কোন ক্ষতির আশঙ্কা না করে তাহলে সিয়াম পালন করতে পারে। আর যদি সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে তাহলে সিয়াম ভেঙ্গে ফেলা ওয়াজিব।

প্রশ্ন ১০৬ : গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারিনী মহিলার ভাঙ্গা রোযার বদলে কি শুধু কাযা করবে নাকি ফিদইয়া দিবে?

উত্তর : শুধু কাযা করবে।

প্রশ্ন ১০৭ : ফিদইয়ার পরিমাণ কত?

উত্তর : এক মুদ (৫১০ গ্রাম) পরিমাণ গম।

تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ

অর্থাৎ প্রতি একদিনের রোযার বদলে একজন মিসকীনকে এক মুদ (৫১০ গ্রাম) পরিমাণ গম (ভাল খাবার) প্রদান করবে। (বাইহাকী : ৪/৩৮৯)

তবে এ বিষয়ে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছ থেকে সরাসরি কোন হাদীস না থাকায় এতে অনেক মতবিরোধ রয়েছে।

প্রশ্ন ১০৮ : গর্ভবতী নারীর পক্ষ থেকে কে ফিদইয়া দেবে?

উত্তর : সন্তানের পিতা বা তার ভরণ-পোষণের যিম্মাদার ব্যক্তি।

প্রশ্ন ১০৯ : গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী নারীরা কাযা রোযা কখন করবে?

উত্তর : যখন তার জন্য সহজ হবে এবং সন্তানের ক্ষতির কোন আশঙ্কা যখন থাকবে না তখন কাযা করবে।

২০শ অধ্যায়

ঋতুবতী মহিলাদের সিয়াম

প্রশ্ন ১১০ : ঋতুবতী মহিলা বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : বালেগ হওয়ার পর মহিলাদের প্রতিমাসে ৬/৭ দিন বা কমবেশি মেয়াদে শরীর থেকে রক্তক্ষরণ হয়। এটাকে বলা হয় মাসিক ঋতুস্রাব বা হায়েয। আর সন্তান প্রসবের পর রক্ত রক্তক্ষরণ হয় প্রায় ৪০ দিন ব্যাপী। এটাকে বলা হয় নিফাস। এ দু' অবস্থায়ই মহিলাদেরকে ঋতুবর্তী বলা হয়। তখন তারা নাপাক বা অপবিত্র থাকে।

প্রশ্ন ১১১ : এ দু' অবস্থায় মেয়েদের কী কী কাজ ও ইবাদত নিষিদ্ধ?

উত্তর : সালাত, সাওম ও স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলন, কুরআন স্পর্শ করা, মাসজিদে যাওয়া ও কাবা তাওয়াফ করা।

প্রশ্ন ১১২ : হায়েয ও নিফাস থেকে পবিত্র হওয়ার পর সালাত, রোযা কীভাবে কাযা করবে?

উত্তর : সালাত কাযা করতে হবে না। তবে এ কারণে যতটা রোযা ভাঙ্গা গেছে ঠিক ততটা রোযাই আবার কাযা করতে হবে।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন :

فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ

“সিয়াম কাযা করতে আমাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছিল, কিন্তু সালাত কাযা করতে আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় নি।” (মুসিলম : ৩৩৫)

প্রশ্ন ১১৩ : যদি কোন সিয়াম পালনকারী নারীর সূর্যাস্তের সামান্য কিছু পূর্বে মাসিক স্রাব শুরু হয়ে যায় তাহলে কি করবে?

উত্তর : উক্ত সিয়াম বাতিল হয়ে যাবে এবং পরে এটা কাযা করতে হবে।

প্রশ্ন ১১২ : যদি কোন মেয়ে রমযান মাসের দিনের বেলায় কোন অংশে হায়েয বা নিফাস থেকে পবিত্র হয় তাহলে দিবসের বাকী অংশে কি রোযা রাখবে?

উত্তর : না, রাখবে না। কারণ সিয়ামের শুরু দিনের প্রথম থেকে হতে হবে। কাজেই এ সিয়াম পরে কাযা করবে। তবে দিনের বাকী অংশে খাওয়া দাওয়া থেকে বিরত থাকবে।

প্রশ্ন ১১৪ : যদি ফজরের সামান্য আগে হায়েয বা নিফাস থেকে পবিত্র হয় তাহলে কি করবে?

উত্তর : তাহলে ঐ দিনে সিয়াম পালন করা তার উপর ফরয। এমনকি গোসল করার সময় না থাকলেও।

প্রশ্ন ১১৫ : ফজরের পূর্বক্ষণে হায়েয বা নিফাস থেকে পবিত্র হল। কিন্তু গোসল করার সময় পেল না। এ অবস্থায় কি রোযা রাখার নিয়ত করবে?

উত্তর : হা, এ অবস্থায় রোযার নিয়ত করতেই হবে। ঐ দিন সিয়াম পালন করা তার ফরয। ফরয গোসল ছাড়াই রোযা শুরু করতে পারবে। কিন্তু ফজরের সালাত পড়তে হবে গোসলের কাজ সেরে।

প্রশ্ন ১১৬ : অভ্যাসের কারণে যে মহিলা জানে যে, আগামী কাল থেকে তার মাসিক শুরু হবে সে রোযার নিয়ত করবে কি করবে না?

উত্তর : অবশ্যই রোযার নিয়ত করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত রক্ত দেখতে না পাবে ততক্ষণ রোযা ভঙ্গ করবে না।

প্রশ্ন ১১৭ : সন্তান প্রসবের কারণে নিফাসওয়ালী মহিলা যদি ৪০ দিনের পূর্বেই পাক হয়ে যায় তাহলে কী করবে?

উ: গোসল করে পাক হয়ে রোযা রাখা ও নামায পড়া শুরু করে দিবে।

প্রশ্ন ১১৮ : নিফাসওয়ালী নারীর যদি ৪০ দিন পার হওয়ার পরও রক্ত বন্ধ না হয় তাহলে কি করবে?

উত্তর : চল্লিশতম দিন পার হলে গোসল করে রোযা রাখা শুরু করবে। অতিরিক্ত মেয়াদের এ অবস্থাকে ধরে নেবে ইস্তেহাদা বা রক্তপ্রদর রোগ। আর রক্তপ্রদর হলে রোযা ভঙ্গ করা জায়েয নয়।

প্রশ্ন ১১৯ : যদি কোন নারী মনে করে যে, টেবলেট খেয়ে হায়েয বা মাসিক বন্ধ করে ফরয রোযা চালিয়ে যাবে। এ কাজটির হুকুম কী?

উত্তর : এটাকে জায়েয তবে কৃত্রিম উপায়ে স্বাভাবিক ঋতুস্রাবকে দেরী করানো উচিত নয়। এ ব্যাপারে ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া যেতে পারে।

প্রশ্ন ১২০ : হায়েয ও নিফাসওয়ালী মহিলা কীভাবে বুঝবে যে সে ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হয়ে গেছে?

উত্তর : যখন দেখবে যে তার ঋতুস্রাব সাদা রঙে পরিণত হয়ে গেছে, তখন বুঝবে সে পাক হয়ে গেছে। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলতেন :

لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقِصَّةَ الْبَيْضَاءَ

“তোমরা তাড়াহুড়া করে হায়েয বন্ধ হয়ে গেছে মনে করো না। যতক্ষণ না শুভ্র পানি দেখতে পাও।” (বুখারী : ৩১৯)

প্রশ্ন ১২১ : যে মহিলা বালেগ হওয়ার পর কোন রোযা রাখে নি। সে এখন লজ্জিত, অনুতপ্ত ও তাওবাহ করতে চায়। সে কি করবে?

উত্তর : এখন থেকে ভবিষ্যতে আর সিয়াম ভঙ্গ না করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করবে। পূর্বের গোনাহের জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চাইবে, তাওবাহ করবে। ছেড়ে দেয়া প্রত্যেক রোযার জন্য একটি করে রোযা কাযা করতে হবে।

প্রশ্ন ১২২ : যে মহিলা মাসিকের সময় না রাখা রোযাগুলো কাযা করেনি সে কি করবে?

উত্তর : উপরে বর্ণিত একই কায়দায় সমপরিমাণ রোযা কাযা করবে।

প্রশ্ন ১২৩ : স্বামী উপস্থিত। স্ত্রী নফল বা সুন্নাত রোযা রাখতে চায়, কি করবে?

উত্তর : স্বামীর অনুমতি নিতে হবে। নতুবা জায়েয নয়।

প্রশ্ন ১২৪ : স্ত্রী ফরয রোযা রাখছে। এমতাবস্থায় স্বামীকে সহবাসের অনুমতি দিল। এর হুকুম কী?

উত্তর : স্বামীর মতই স্ত্রীকেও এ অপরাধে কাযা ও কাফফারা দিতে হবে। অর্থাৎ দু'জনের প্রত্যেককেই একাধারে ৬০ দিন রোযা রাখতে হবে। মাঝখানে কোন বিরতি দেয়া যাবে না। বিরতি দিলে শুরু থেকে আবার নতুন করে ১+৬০= ৬১ রোযা রাখবে। এভাবে চালিয়ে যাবে। এতে অপারগ হলে প্রতি একটা রোযার জন্য ৬০ জন মিসকীনকে এক বেলা খানা খাওয়াতে হবে।

প্রশ্ন ১২৫ : স্রাবের কারণে কাযা সিয়াম কোন উযর বা যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া পরবর্তী রমযান চলে আসার আগে কাযা করতে পারল না। এ অবস্থায় কি করবে?

উত্তর : এরূপ বিলম্বিত হওয়া গোনাহের কাজ। এজন্য তাওবাহ করতে হবে এবং পূর্বে বর্ণিত নিয়মে কাযা করবে অর্থাৎ যে কটা রোযা ভাঙ্গা

হয়েছে শুধু সেক'টিই কাযা করতে হবে। চলতি রমযানের ফরয রোযা শেষ করার পর।

প্রশ্ন ১২৬ : কাযা ও কাফফারা উভয় ওয়াজিব। সেক্ষেত্রে কাযা কোনটি ও কাফফারা কোনটি?

উত্তর : কাযা হল সিয়ামের বদলে সিয়াম পালন করা। আর কাফফারা হলো মিসকীনকে খাবার খাওয়ানো।

২১শ অধ্যায়

صلاة التراويح

তারাবীহর সালাত

প্রশ্ন ১২৭ : তারাবীহ অর্থ কি? এ সালাতকে কেন তারাবীহ নামকরণ করা হল?

উত্তর : তারাবীহ শব্দের অর্থ বিশ্রাম করা। তারাবীহ বহু দীর্ঘায়িত একটি সালাত। প্রতি চার রাকআত শেষে যাতে একটু বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারে সেজন্য এর নামকরণ করা হয়েছে তারাবীহ।

প্রশ্ন ১২৮ : রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র তারাবীহর সালাত কী ধরণের বৈশিষ্টমন্ডিত ছিল?

উত্তর : লম্বা ও অনেক আয়াত এবং দীর্ঘ সময় নিয়ে তিনি তারাবীহ পড়তেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' রাতের একাকী সকল সালাতই ছিল অতি দীর্ঘ। এমনকি কিয়াম, রুকু, সাজদা সবই ছিল খুব লম্বা ও ধীরস্থির।

আসসায়িব ইবনে ইয়াযিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন :

كَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِئِينَ يَعْنِي بِمِئَاتِ الآيَاتِ حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعَصَى مِنْ طُوْلِ الْقِيَامِ

অর্থাৎ ইমাম (পাঠক) সাহেব তারাবীহতে শত শত আয়াত পড়তেন। ফলে সুদীর্ঘ সময় দাঁড়ানোর কারণে আমরা লাঠির উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। (মুয়াত্তা : ১/১১৪)

প্রশ্ন ১২৯ : তারাবীহ সর্বপ্রথম কোথায় চালু হয়।

উ: আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম মসজিদে নববীতে তারাবীহর সালাত সুন্নাত হিসেবে চালু করেন।

প্রশ্ন ১৩০ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি নিয়মিত প্রত্যহ জামা'আতের সাথে তারাবীহ পড়তেন?

উত্তর : না। সাহাবায়ে কিরাম দুই বা তিন রাত্রি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র ইমামতিতে তারাবীহ পড়েছিলেন। উম্মাতের উপর এ সালাত ফরয হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরে জামাআতের সাথে মসজিদে তারাবীহ পড়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন,

وَلَمْ يَمْنَعْنِيْ مِنَ الْخُرُوْجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّيْ خَشِيْتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ فِيْ رَمَضَانَ

অর্থাৎ (তারাবীহর সালাতে মসজিদে তোমরা একত্রিত হয়ে আমার জন্য যেভাবে অপেক্ষা করছিলে তা সবই আমি দেখেছি) কিন্তু আমার ভয় হচ্ছিল (আমি নিয়মিত এ সালাত আদায় করলে) তা তোমাদের জন্য ফরয হয়ে যেতে পারে। সে কারণে আমি (এ সালাতের জন্য) ঘর থেকে বের হইনি। আর এ ঘটনাটি ছিল রমযান মাসের (কোন এক রাতে)। (বুখারী : ২০১২; মুসলিম : ৭৬১)

প্রশ্ন ১৩১ : তারাবীহর সালাত কত রাক'আত?

উত্তর : এটি একটি ইখতিলাফী অর্থাৎ মতবিরোধপূর্ণ মাস্‌আলা। কেউ কেউ বলেছেন, বিতরসহ তারাবীহ ৪১ রাক'আত। অর্থাৎ বিতর ৩ রাকআত হলে তারাবীহ হবে ৩৮ রাক'আত। অথবা বিতর ১ রাকআত ও তারাবীহ ৪০ রাকআত। এভাবে তারাবীহ ও বিতর মিলে :

কেউ বলেছেন ৩৯ রাকআত (তারাবীহ ৩৬ + বিতর ৩)

কেউ বলেছেন ২৯ রাকআত (তারাবীহ ২৬ + বিতর ৩)

কেউ বলেছেন ২৩ রাকআত (তারাবীহ ২০ + বিতর ৩)

কেউ বলেছেন ১৯ রাকআত (তারাবীহ ১৬ + বিতর ৩)

কেউ বলেছেন ১৩ রাকআত (তারাবীহ ১১ + বিতর ৩)

কেউ বলেছেন ১১ রাকআত (তারাবীহ ৮ + বিতর ৩)

২০ রাক‘আত তারাবীহ সালাতের পক্ষে দলীল

(ক) বিতর ছাড়া ২০ রাক‘আত তারাবীহ সালাতের পক্ষে দলীল হল মুসান্নাফে আঃ রায্যাক হতে বর্ণিত ৭৭৩০ নং হাদীস, যেখানে বর্ণিত হয়েছে :

أَنَّ عُمَرَ جَمَعَ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ عَلَى أُبَيِّ بنِ كَعَبٍ وَعَلَى تَمِيْمِ الدَّارِيْ عَلَى إِحْدى وَعِشْرِيْنَ مِنْ رَكْعَةٍ يَقْرَؤُنَ بِالْمَئِيين

উমার (রাযি.) রমযানে উবাই ইবনে কাব ও তামীম আদদারীকে ইমামতিতে লোকদেরকে একুশ রাকআত সালাতের প্রতি জামাআতবদ্ধ করেছিলেন। (অর্থাৎ তারাবীহ ২০ ও বিতর ১ রাকআত)

(খ) আবদুল্লাহ ইবনে আববাস বলেছেন যে,

كَانَتْ صَلاَةُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- ثَلاَثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً يَعْنِيْ مِنَ اللَّيْلِ

“নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’র রাতের সালাত ছিল ১৩ রাক‘আত।” (বুখারী : ১১৩৮; মুসলিম : ৭৬৪)

(গ) মা আয়িশাহ বলেন,

مَا كَانَ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلاَ غَيْرِهِ عَلَى إِحْدى عَشَرَةَ رَكْعَةً

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান ও অন্য সময়ে (রাতে) ১১ রাকআতের অধিক সালাত আদায় করতেন না। (বুখারী : ২০১৩; মুসলিম : ৭৩৮) অর্থাৎ তারাবীহ ৮ রাকাআত এবং বিতর ৩ রাকাআত।

(ঘ) ইবনে ইয়াযিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

أَمَرَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُبَيْ بْنِ كَعَبٍ وَتَمِيْمَا الدَّارِيِّ أَن يَّقُوْمَ لِلنَّاسِ بِإِحْدى عَشَرَةَ رَكْعَةٍ

‘উমার ইবনু খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু (তার দুই সঙ্গী সাহাবী) উবাই ইবনে কাব তামীম আদদারীকে এ মর্মে নির্দেশ দিলেন যে, তারা যেন লোকদেরকে নিয়ে (রমযানের রাতে) ১১ রাকআত কিয়ামুল্লাইল (অর্থাৎ তারাবীহর সালাত) আদায় করে। (মুয়াত্তা মালেক : ১/১১৫)

উল্লেখ্য যে, সৌদী আরবের মসজিদগুলোতে তারাবীহ ও বিতর মিলে ১১ বা ১৩ রাকআত পড়লেও মাক্কার হারামে ও মাদীনার মসজিদে নববীতে তারাবীহ ২০ এবং বিতর ৩ মিলিয়ে মোট ২৩ রাকআত পড়ে থাকে।

প্রশ্ন ১৩২ : তারাবীহর সংখ্যার মতবিরোধের মধ্যে কোনটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য?

উত্তর : মালেকী মাযহাবের ইমাম মালেক (রহঃ) বলেছেন, একশ বছরেরও বেশি সময় ধরে লোকেরা ৩৬ রাকআত তারাবীহ পড়েছে। শাফেঈ মাযহাবের ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেছেন, তিনি তারাবীহ মদীনায় ৩৬ এবং মাক্কায় ২০ রাকআত পড়তে দেখেছেন। সৌদী আরবের গ্র্যান্ড মুফতী সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেমে দ্বীন আল্লামা মুহাম্মাদ বিন

সালেহ আল উসাইমীন (রহ.) ১০ ও আট রাকআতের মাসআলাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

এ জাতীয় মত পার্থক্যের সমাধানকল্পে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা (রহ.) বলেছেন, অধিক সংখ্যক রাকআত পড়াই উত্তম। আর যদি কেউ কম সংখ্যক রাকআত পড়তে চায় তাহলে তার উচিত হবে তিলাওয়াত, কিয়াম, রুকু ও সিজদা দীর্ঘ করা। তিনি আরো বলেছেন যে, তারাবীহকে রাকআত সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বরং সময় ব্যয়ের পরিমাণ দিয়ে মূল্যায়ন করা উচিত। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু ১১ রাকআতের মধ্যে ৫ ঘণ্টা সময় অতিবাহিত করেছেন। সালাতের কিয়ামে এত দীর্ঘ সময় কেটে যেত যার কারণে সাহাবীগণ লাঠির উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন।

সবশেষে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা (রহঃ) আরেকটি মত ব্যক্ত করে বলেছেন, সার্বিক বিশ্লেষণে তারাবীহ ২০ রাকআত পড়াই উত্তম। কারণ এটা ১০ ও ৪০ রাকআতের মাঝামাঝি এবং বেশির ভাগ মুসলমানের আমলও এরই উপর।

তবে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, আমাদের দেশে তারাবীহ যেভাবে তাড়াহুড়া করে পড়া হয় তা পরিহার করে বিশুদ্ধ ও ধীরস্থির তিলাওয়াত, রুকু থেকে উঠার পর এবং দু' সিজদার মাঝে আরো একটু সময়ক্ষেপণ করা, সুন্নাত মোতাবিক ও ধীরস্থিরভাবে রুকু-সিজদাহ ইত্যাদি সুন্দর করে তারাবীহ আদায় করা অত্যাবশ্যক। যে পদ্ধতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের সালাত আদায় করতেন আমাদেরও উচিত সে তরীকামত আদায় করা।

প্রশ্ন ১৩২ : তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের ফযীলত জানতে চাই।

উত্তর : (ক) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈমান অবস্থায় সাওয়াবের আশায় রাতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ আদায় করবে, আল্লাহ তাঁর পূর্ববর্তী (সগীরা) গুনাহগুলো মাফ করে দেবেন। (বুখারী : ৩৭; মুসলিম : ৭৫৯)

إِيْمَانًا ঈমান অবস্থায় অর্থ হল, এমন বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহ তাকে এ কাজের বদলা দিবেন এবং اِحْتِسَابًا অর্থ হল, এমনভাবে সাওয়াব আশা করবে যে, রাতের এ সালাত আদায় কোন মানুষকে দেখাবার বা শুনাবার জন্য নয় বরং শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য এবং তা শুধুমাত্র আল্লাহরই কাছ থেকে পুরস্কার লাভের আশায়।

(খ) অন্য হাদীসে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ

ফরয সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হল রাতের সালাত (অর্থাৎ তাহাজ্জুদের সালাত)। (মুসলিম : ১১৬৩)

প্রশ্ন ১৩৩ : তারাবীহ সালাতের জামাআতে নারীদের শরীক হওয়া কি জায়েয?

উত্তর : ফিতনা-ফ্যাসাদের আশঙ্কা না থাকলে মাসজিদে তারাবীহর জামা'আতে হাজির হওয়া মেয়েদের জন্য জায়েয আছে। আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لاَ تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ

“তোমরা আল্লাহর বান্দা নারীদেরকে মাসজিদে যেতে নিষেধ করো না।” (বুখারী : ৯০০; মুসলিম : ৪৪২)

প্রশ্ন ১৩৪ : নারীরা মাসজিদে গেলে তাদের চালচলন ও পোশাক আশাক কী ধরনের হওয়া উচিত?

উত্তর : সম্পূর্ণ শরীয়াতসম্মত পর্দা করে মসজিদে যাবে। বাহারী ও রঙ বেরঙের বোরকা ও টাইট-ফিট পোশাক পরবে না। গল্পগুজব ও আওয়াজ করে কথা বলবে না। মেয়েদের নির্ধারিত স্থানে গিয়ে সালাত আদায় করবে। ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর পরপরই মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাবে।

প্রশ্ন ১৩৫ : জামাআতে সালাত আদায় করলে নারীদের কোথায় দাঁড়ানো উত্তম?

উত্তর : নারীরা পিছনে দাঁড়াবে। এটাই সুন্নাত। তারা যত পিছনে দাঁড়াবে ততই উত্তম। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا

পুরুষদের উত্তম কাতার হলো প্রথম কাতার আর নিকৃষ্ট হলো শেষ কাতার। পক্ষান্তরে মহিলাদের জন্য উত্তম হলো শেষ কাতার আর নিকৃষ্ট হলো প্রথমকাতার। (মুসলিম : ৪৪০)

২২শ অধ্যায়

বিতরের সালাত

প্রশ্ন ১৩৬ : বিতরের সালাত কত রাকআত?

উত্তর : বিতরের সালাতের সর্বনিম্ন সংখ্যা হল এক রাক'আত এবং সর্বোচ্চ হল ১১ রাকআত।

(ক) বিতরের সালাত ১ রাকআত পড়াও জায়েয আছে। আল্লাহ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَنْ أَحَبُّ أَن يُّؤْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ

অর্থাৎ কেউ যদি ১ রাকআত বিতর পড়তে চায়, তা সে করতে পারে। (আবূ দাউদ : ১৪২২; নাসাঈ : ১৭১২)

(খ) আবার তিন রাকআত বিতর পড়া যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ أَحَبَّ أَن يُّؤْتِرَ بِثَلاَثٍ فَلْيَفْعَلْ

"যে ব্যক্তি বিতরের সালাত ৩ রাকআত পড়তে চায়, তা সে পড়তে পারে।" (আবূ দাউদ : ১৪২২; নাসাঈ : ১৭১২)

(গ) বিতর ৫ রাক'আতও পড়ার নিয়ম আছে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَنْ أَحَبَّ أَن يُّؤْتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ

"কেউ ৫ রাকআত বিতর পড়তে চাইলে তা সে পড়তে পারে।" (আবূ দাউদ : ১৪২২; নাসাঈ : ১৭১২)

এভাবে ৭ বা ৯ বা ১১ রাকআত পর্যন্ত বিতরের সালাত আদায় করার সুযোগ আছে, জায়েয আছে।

প্রশ্ন ১৩৭ : বিতরের সালাতে কি একবার নাকি দু'বার সালাম ফিরাব?

উত্তর : দু'টাই করা জায়েয আছে।

(ক) এক সালামে বিতর পড়ার দলীল :

মিসওয়ার বিন মাখরামা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

دَفَنَّا أَبَا بَكْرٍ لَيْلًا ، فَقَالَ عُمَرُ: «إِنِّي لَمْ أُوتِرْ ، فَقَامَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ ، فَصَلَّى بِنَا ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ، لَمْ يُسَلِّمْ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ»

রাতের বেলা আমরা আবূ বাকার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে দাফন করলাম। অতপর উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'আমি বিতর পড়িনি। এই বলে তিনি দাঁড়ালেন আর আমার তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে গেলাম। এরপর তিনি আমাদের নিয়ে ৩ রাকআত বিতর পড়তেন। শেষ রাকআতের আগে তিনি সালাম ফিরাতেন না (এক সালামে তিন রাকাত বিতর পড়তেন)। (ত্বহাবী : ১৭৪২)

(খ) দু' সালামে বিতর পড়ার দলীল :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ فِي الْوِتْرِ حَتَّى بِأَمْرِ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ

আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু (বিতরে সালাত) প্রথম দুই রাকআত শেষ করে সালাম ফিরাতেন এবং পরে শেষ (তৃতীয়) রাকআতে আবার সালাম ফিরাতেন। প্রথম দুই রাকআতের সালাম ফিরানের পর প্রয়োজনে কোন কাজের নির্দেশও দিতেন। (বুখারী : ৯২১)

প্রশ্ন ১৩৮ : বিতরের সালাতের আগেই জামাত ছেড়ে যাওয়া কি জায়েয?

উত্তর : ইমাম বিতর শেষ না করা পর্যন্ত জামাআত ছেড়ে চলে যাওয়া ঠিক নয়। কারণ বিতর দ্বারা পুরো রাত্রি জাগরণের অর্থাৎ কিয়ামুল্লাইলের পূর্ণ সওয়াব অর্জিত হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

أَنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الإمَام حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

অর্থাৎ ইমাম নামায শেষ না করা পর্যন্ত যে ব্যক্তি ইমামের সাথে (জামাআতে) তারাবীহ পড়ল তার জন্য পূর্ণ রাত নফল পড়ার সাওয়াব লেখা হয়ে গেল। (তিরমিযী : ৮০৬)

২৩শ অধ্যায়

ليلة القدر

লাইলাতুল কদর

প্রশ্ন ১৩৯ : লাইলাতুল কদরের মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ও ফযীলাত জানতে চাই।

উত্তর : (১) এ রাতে আল্লাহ তা‘আলা পুরা কুরআন কারীমকে লাউহে মাহফুয থেকে প্রথম আসমানে নাযিল করেন। তাছাড়া অন্য আরেকটি মত আছে যে, এ রাতেই কুরআন নাযিল শুরু হয়। পরবর্তী ২৩ বছরে বিভিন্ন সূরা বা সূরার অংশবিশেষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনা ও অবস্থার প্রেক্ষিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’র উপর অবতীর্ণ হয়।

(২) এ এক রজনীর ইবাদত হাজার মাসের ইবাদতের চেয়েও উত্তম।

(৩) এ রাতে পৃথিবীতে অসংখ্য ফেরেশতা নেমে আসে এবং তারা তখন দুনিয়ার কল্যাণ, বরকত ও রহমাত বর্ষণ করতে থাকে।

(৪) এটা শান্তি বর্ষণের রাত। এ রাতে ইবাদত গুজার বান্দাদেরকে ফেরেশতারা জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তির বাণী শুনায়।

(৫) এ রাতের ফাযীলত বর্ণনা করে এ রাতেই একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা নাযিল হয়। যার নাম সূরা কদর।

(৬) এ রাতে নফল সালাত আদায় করলে মুমিনদের অতীতের সগীরা গুনাহগুলো মাফ করে দেয়া হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَامَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

অর্থ : যে ব্যক্তি ঈমান ও সাওয়াব লাভের আশায় কদরের রাতে নফল সালাত আদায় ও রাত জেগে ইবাদত করবে আল্লাহ তার ইতোপূর্বের সকল সগীরা (ছোট) গুনাহ ক্ষমা করেদেন। (বুখারী : ১৯০১; মুসলিম : ৭৬০)

প্রশ্ন ১৪০ : কোন রাতটি লাইলাতুল কদর?

উত্তর : এ প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ হাদীসে নিম্নবর্ণিত বাণী রয়েছে :

[১] এ রাতটি রমযান মাসে। আর এ রাতের ফযীলত কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে।

[২] এ রাতটি রমাযানের শেষ দশকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

تَحَرُّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

"রমাযানের শেষ দশদিনে তোমরা কদরের রাত তালাশ কর।" (বুখারী : ২০২০; মুসলিম : ১১৬৯)

[৩] আর এটি রমযানের বেজোড় রাতে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

تَحَرُّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

"তোমরা রমাযানের শেষ ১০ দিনের বেজোড় রাতগুলোতে কদরের রাত খোঁজ কর।" (বুখারী : ২০১৭)

[৪] এ রাত রমযানের শেষ সাত দিনে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلْيَتَحَرِّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ

“যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদর (কদরের রাত) অন্বেষণ করতে চায়, সে যেন রমাযানের শেষ সাত রাতের মধ্য তা অন্বেষণ করে।” (বুখারী : ২০১৫; মুসলিম : ১১৬৫)

[৫] রমাযানের ২৭ শে রজনী লাইলাতুল কদর হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

ক. উবাই ইবনে কাব হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন যে,

وَاللهِ إِنِّيْ لأَعْلَمُ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِيْ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بِقِيَامِهَا هِىَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ

আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি যতদূর জানি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যে রজনীকে কদরের রাত হিসেবে কিয়ামুল্লাইল করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা হল রমাযানের ২৭ তম রাত। (মুসলিম : ৭৬২)

(খ) আব্দুল্লাহ বিন ‘উমার থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلْيَتَحَرِّهَا لَيْلَةَ السَّبْعِ وَالْعِشْرِيْنَ

“যে ব্যক্তি কদরের রাত অর্জন করতে ইচ্ছুক, সে যেন তা রমাযানের ২৭শে রজনীতে অনুসন্ধান করে। (আহমাদ : ২/১৫৭)

[৬] কদরের রাত হওয়ার ব্যাপারে সম্ভাবনার দিক থেকে পরবর্তী দ্বিতীয় সম্ভাবনা হল ২৫ তারিখ, তৃতীয় হল ২৯ তারিখে। চতুর্থ হল ২১ তারিখ। পঞ্চম হল ২৩ তারিখের রজনী।

[৭] সর্বশেষ আরেকটি মত হল- মহিমান্বিত এ রজনীটি স্থানান্তরশীল। অর্থাৎ প্রতি বৎসর একই তারিখে বা একই রজনীতে তা হয় না এবং

শুধুমাত্র ২৭ তারিখেই এ রাতটি আসবে তা নির্ধারিত নয়। আল্লাহর হিকমত ও তাঁর ইচ্ছায় কোন বছর তা ২৫ তারিখে, কোন বছর ২৩ তারিখে, কোন বছর ২১ তারিখে, আবার কোন বছর ২৯ তারিখেও হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ১৪১ : কেন এ রাতকে অস্পষ্ট করে গোপন রাখা হয়েছে। এটা স্পষ্ট করে নির্দিষ্ট করে বলা হয় নি কেন?

উত্তর : এ রাতের পুরস্কার লাভের আশায় কে কত বেশি সক্রিয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এবং কত বেশি সচেষ্ট হয়, আর কে নাফরমান ও আলসে ঘুমিয়ে রাত কাটায় সম্ভবতঃ এটা পরখ করার জন্যই আল্লাহ তা'আলা এ রাতকে গোপন ও অস্পষ্ট করে রেখেছেন।

প্রশ্ন ১৪২ : যে রাতটি লাইলাতুল কদর হবে সেটি বুঝার কি কোন আলামত আছে?

উত্তর : হাঁ, সে রাতের কিছু আলামত হাদীসে বর্ণিত আছে। সেগুলো হল :

(১) রাতটি গভীর অন্ধকারে ছেয়ে যাবে না।

(২) নাতিশীতোষ্ণ হবে। অর্থাৎ গরম বা শীতের তীব্রতা থাকবে না।

(৩) মৃদুমন্দ বাতাস প্রবাহিত হতে থাকবে।

(৪) সে রাতে ইবাদত করে মানুষ অপেক্ষাকৃত অধিক তৃপ্তিবোধ করবে।

(৫) কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে আল্লাহ স্বপ্নে হয়তো তা জানিয়েও দিতে পারেন।

(৬) ঐ রাতে বৃষ্টি বর্ষণ হতে পারে।

(৭) সকালে হালকা আলোকরশ্মিসহ সূর্যোদয় হবে। যা হবে পূর্ণিমার চাঁদের মত। (সহীহ ইবনু খুযাইমাহ : ২১৯০ ; বুখারী : ২০২১ ; মুসলিম : ৭৬২)

প্রশ্ন ১৪৩ : রমাযানের শেষ দশ রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী ধরণের ইবাদত করতেন?

উত্তর : তাঁর ইবাদতের অবস্থা ছিল নিম্নরূপ :

১. প্রথম ২০ রাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ রাত জাগরণ করতেন না। কিছু সময় ইবাদত করতেন, আর কিছু অংশ ঘুমিয়ে কাটাতেন। কিন্তু রমাযানের শেষ দশ রাতে তিনি বিছানায় একেবারেই যেতেন না। রাতের পুরো অংশটাই ইবাদত করে কাটাতেন।

সে সময় তিনি কুরআন তিলাওয়াত, সালাত আদায় সদাকা প্রদান, যিকর, দু'আ, আত্মসমালোচনা ও তাওবাহ করে কাটাতেন। আল্লাহর রহমাতের আশা ও তার গজবের ভয়ভীতি নিয়ে সম্পূর্ণ খুশুখুজু ও বিনম্রচিত্তে ইবাদতে মশগুল থাকতেন।

২. হাদীসে এসেছে সে সময় তিনি শক্ত করে তার লুঙ্গি দ্বারা কোমর বেধে নিতেন। এর অর্থ হল, রাতগুলোতে। তাঁর সমস্ত শ্রম শুধু ইবাদতের মধ্যেই নিমগ্ন ছিল। নিজে যেমন অনিদ্রায় কাটাতেন তাঁর স্ত্রীদেরকেও তখন জাগিয়ে দিতেন ইবাদত করার জন্য।

৩. কদরের রাতের ইবাদতের সুযোগ যাতে হাতছাড়া হয়ে না যায় সেজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ দশদিনের পুরো সময়টাতে ইতেকাফরত থাকতেন। (মুসলিম : ১১৬৭)

প্রশ্ন ১৪৪ : মহিমান্বিত লাইলাতুল কদরে আমরা কী কী ইবাদত করতে পারি?

উত্তর : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে এ রাত কাটাতেন এর পূর্ণ অনুসরণ করাই হবে আমাদের প্রধান টার্গেট। এ লক্ষ্যে আমাদের নিম্নবর্ণিত কাজগুলো করা আবশ্যক :

(ক) নিজে রাত জেগে ইবাদত করা এবং নিজের অধীনস্ত ও অন্যদেরকেও জাগিয়ে ইবাদতে উদ্বুদ্ধ করা।

(খ) লম্বা সময় নিয়ে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ পড়া। এসব সালাতে কিরাআত ও রুকু-সিজদা লম্বা করা। রুকু থেকে উঠে এবং দুই সিজদায় মধ্যে আরো একটু বেশি সময় অতিবাহিত করা, এসময় কিছু দু'আ আছে সেগুলে পড়া।

(গ) সিজদার মধ্যে তাসবীহ পাঠ শেষে দু'আ করা। কেননা সিজদাবনত অবস্থায় মানুষ তার রবের সবচেয়ে নিকটে চলে যায়। ফলে তখন দু'আ কবুল হয়।

(ঘ) বেশি বেশি তাওবা করবে আস্তাগফিরুল্লাহ পড়বে। ছগীরা কবীরা গোনাহ থেকে মাফ চাইবে। বেশি করে শির্কী গোনাহ থেকে খালেছ ভাবে তাওবা করবে। কারণ ইতিপূর্বে কোন শির্ক করে থাকলে নেক আমল তো কবুল হবেই না, বরং অর্জিত অন্য ভাল আমলও বরবাদ হয়ে যাবে। ফলে হয়ে যাবে চিরস্থায়ী জাহান্নামী।

(ঙ) কুরআন তিলাওয়াত করবে। অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ কুরআন অধ্যয়নও করতে পারেন। তাসবীহ তাহলীল ও যিকর-আযকার করবেন। তবে যিকর করবেন চুপিসারে, নিরবে ও একাকী এবং কোন প্রকার জোরে আওয়ায করা ছাড়া। এভাবে যিকর করার জন্যই আল্লাহ কুরআনে বলেছেন :

﴿ وَٱذۡكُر رَّبَّكَ فِي نَفۡسِكَ تَضَرُّعٗا وَخِيفَةٗ وَدُونَ ٱلۡجَهۡرِ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ بِٱلۡغُدُوِّ وَٱلۡأٓصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلۡغَٰفِلِينَ ٢٠٥ ﴾ [الاعراف: ٢٠٥]

"সকাল ও সন্ধ্যায় তোমার রবের যিকর কর মনে মনে বিনয়ের সঙ্গে ভয়ভীতি সহকারে এবং জোরে আওয়াজ না করে। এবং কখনো তোমরা আল্লাহর যিকর ও স্মরণ থেকে উদাসীন হয়োনা।" (আরাফ : ২০৫)

অতএব, দলবেধে সমস্বরে জোরে জোরে উচ্চ স্বরে যিকর করা বৈধ নয়। এভাবে সম্মিলিত কোন যিকর করা কুরআনেও নিষেধ আছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তা করেন নি। যিকরের শব্দগুলো হল: সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার ইত্যাদি।

(চ) একাগ্রচিত্তে দু'আ করা। বেশি বেশি ও বারবার দু'আ করা। আর এসব দু'আ হবে একাকী ও বিনম্র চিত্তে কবুল হওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে। দু'আ করবেন নিজের ও আপনজনদের জন্য. জীবিত ও মৃতদের জন্য, পাপমোচন ও রহমত লাভের জন্য, দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির জন্য। তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রাতে নিম্নের এ দু'আটি বেশি বেশি করার জন্য উৎসাহিত করেছেন :

اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ

"হে আল্লাহ! তুমি তো ক্ষমার আধার, আর ক্ষমা করাকে তুমি ভালবাস। কাজেই তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। (তিরমিযী : ৩৫১৩)

২৪শ অধ্যায়

اعتكاف

ই‘তিকাফ

প্রশ্ন ১৪৫ : ই‘তিকাফ কী? এর হুকুম কী?

উত্তর : দুনিয়াবী সকল কাজ থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ আল্লাহর ইবাদতের জন্য মসজিদে অবস্থান করাকে ই‘তিকাফ বলা হয়ে থাকে। ইতেকাফ করা সুন্নাত।

প্রশ্ন ১৪৬ : ই‘তিকাফের উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : দুনিয়াদারীর ঝামেলা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে একাগ্রচিত্তে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হওয়া, বিনয় নম্রতায় নিজেকে আল্লাহর দরবারে সমপর্ণ করা এবং বিশেষ করে লাইলাতুল কদরে ইবাদত করার সুযোগ লাভ করাই ই‘তিকাফের উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন ১৪৭ : ই‘তিকাফের জন্য কী কী শর্ত পূরণ আবশ্যক?

উত্তর : (ক) মুসলমান হওয়া, (খ) জ্ঞান থাকা, (গ) বড় নাপাকী থেকে পবিত্র থাকা, গোসল ফরয হলে গোসল করে নেয়া। (ঘ) মসজিদে ই‘তিকাফ করা।

কাজেই কাফির-মুশরিক, অবুঝ শিশু, পাগল ও অপবিত্র লোক এবং হায়েয-নিফাস অবস্থায় নারীদের ই‘তিকাফ শুদ্ধ হবে না।

প্রশ্ন ১৪৮ : ই‘তিকাফের রুকন কয়টি ও কী কী?

উত্তর : এর রুকন ২টি : (ক) নিয়ত করা, (খ) মাসজিদে অবস্থান করা, নিজ বাড়ীতে বা অন্য কোথাও ই‘তিফাক করলে তা শুদ্ধ হবে না।

প্রশ্ন ১৪৯ : মেয়েরা কি নিজ বাসগৃহে ই'তিকাফ করতে পারবে?

উত্তর : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যামানায় নারীরা মসজিদে ই'তিকাফ করতেন।

প্রশ্ন ১৫০ : ই'তিকাফ অবস্থায় কী কী কাজ নিষিদ্ধ?

উত্তর : তা হল :

(১) স্বামী স্ত্রীর মিলন, স্ত্রীকে চুম্বন ও স্পর্শ করা,

(২) মাসজিদ থেকে বের হওয়া। বেচাকেনা, চাষাবাদ, এমনকি রোগীর সেবা ও জানাযায় অংশ গ্রহণের জন্যও মাসজিদ থেকে বের হওয়া জায়েয নয়। বের হলে ইতেকাফ বাতিল হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ১৫১ : বিশেষ প্রয়োজনে ই'তিকাফ অবস্থায় মাসজিদ থেকে বের হতে পারবে কি?

উত্তর : মাসজিদের গন্ডির মধ্যে ব্যবস্থা না থাকলে শুধুমাত্র মানবিক প্রয়োজনে প্রস্রাব-পায়খানা, খাওয়া-দাওয়া ও পবিত্রতা অর্জনের জন্য মাসজিদ থেকে বের হওয়া জায়েয আছে, দলীল :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا اعْتَكَفَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةِ الإِنْسَانَ

'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, একান্ত (পেশাব-পায়খানার) প্রয়োজন পূরণ ছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ ছেড়ে বাড়িতে প্রবেশ করতেন না।' (মুসলিম : ২৯৭)

তবে মাসজিদে এসব ব্যবস্থা থাকার পর যদি কেউ বাইরে যায় তাহলে ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

ই'তিকাফ অবস্থায় এক রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রী সাফিয়াকে ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়ে এসেছিলেন। (বুখারী)

প্রশ্ন ১৫২ : কী কী কারণে ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যায়?

উত্তর : নিম্ন বর্ণিত যে কোন একটি কাজ করলে ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

১. স্বেচ্ছায় বিনা প্রয়োজনে মাসজিদ থেকে বের হলে।

২. কোন শির্ক বা কুফরী কাজ করলে।

৩. পাগল বা বেঁহুশ হয়ে গেলে।

৪. নারীদের হায়েয-নিফাস শুরু হয়ে গেলে।

৫. স্ত্রীসহবাস বা যে কোন প্রকার যৌনসম্ভোগ করলে।

প্রশ্ন ১৫৩ : ই'তিকাফ অবস্থায় কী কী কাজ করা বৈধ অর্থাৎ মুবাহ?

উত্তর : ই'তিকাফকারীদের জন্য নিম্নোক্ত কাজ করা বৈধ :

১. একান্ত প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা।

২. চুল আঁচড়ানো, মাথা মুণ্ডানো, নখ কাটা, শরীর থেকে ময়লা পরিষ্কার করা, এবং সুগন্ধি ব্যবহার ও উত্তম পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করা।

৩. মসজিদের ভিতরে পানাহার করা, ঘুমানো এবং বিশেষ প্রয়োজনে বিবাহের কাবিননামা ও ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিও সম্পাদন করা যাবে।

প্রশ্ন ১৫৪ : ই'তিকাফকারীর দায়িত্ব ও করণীয় কাজ কী কী? এবং তাঁর কী ধরনের ইবাদত করা উচিত?

উত্তর : উত্তম হল নফল ইবাদত বেশি বেশি করা। যেমন সালাত আদায়, কুরআন তিলাওয়াত ও অধ্যয়ন করা, যিক্র-আযকার ও তাসবীহ, তাহলীল করা অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, তাওবাহ-ইস্তেগফার, দু'আ, দুরূদ ইত্যাদি ইবাদতে সর্বাধিক সময় মশগুল থাকা। তাছাড়া শরীয়া বিষয়ক ইলম চর্চা করা।

পার্থিব ব্যাপারে কথাবার্তা বলা, অনর্থক গল্পগুজব ও আলোচনা থেকে বিরত থাকা উচিত, তবে পারিবারিক কল্যাণর্থে বৈধ কোন বিষয়ে অল্পস্বল্প কথাবার্তা বলার মধ্যে কোন দোষ নেই।

প্রশ্ন ১৫৫ : ই'তিকাফ শুধুই রমযান মাসে? নাকি অন্য সময়ও করা যায়?

উত্তর : বৎসরের যে কোন সময় ই'তিকাফ করা যায়। এজন্য নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট কোন দিন তারিখ নেই। যিনি যখন চাইবেন তখনি ই'তিকাফ করতে পারবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার শাওয়াল মাসেও ই'তিকাফ করেছেন। 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মাত্র এক রাত ই'তিকাফ করেছিলেন।

প্রশ্ন ১৫৬ : ই'তিকাফের জন্য কোনটি উত্তম সময়?

উত্তর : রমযান মাস হচ্ছে ই'তিকাফের উত্তম সময়। আরো উত্তম হচ্ছে রমযানের শেষ দশদিন ই'তিকাফ করা।

প্রশ্ন ১৫৭ : সর্বনিম্ন কী পরিমাণ সময় ই'তিকাফ করা যায়?

উত্তর : এটি একটি মতবিরোধপূর্ণ মাসআলা। শাইখাইনের মতে ই'তিকাফের ন্যূনতম সময়সীমা ১দিন। কেননা, হানাফী মতে ই'তিকাফের জন্য রোযা শর্ত। আর রোযা ১ দিনের কমে পূর্ণ হয় না।

প্রশ্ন ১৫৮ : ই'তিকাফ কখন শুরু ও শেষ করব?

উত্তর : ফযরের সালাত আদায় করে বা সূর্যাস্তের পর ই‘তিকাফে প্রবেশ করা সুন্নাত/মুস্তাহাব। আর শেষ করবে ঈদের চাঁদ দেখা গেলে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটিই করতেন।

প্রশ্ন ১৫৯ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতবার ই‘তিকাফ করেছেন?

উত্তর : প্রত্যেক রমাযানেই তিনি শেষ দশ দিন ই‘তিকাফ করতেন। কিন্তু জীবনের শেষ রমযানে তিনি ই‘তিকাফ করেছিলেন ২০ দিন। এভাবে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কোন বছরই তিনি ই‘তিকাফ থেকে বিরত থাকেননি। (বুখারী)

প্রশ্ন ১৬০ : ই‘তিকাফ কত প্রকার ও কী কী?

উ: ইসলামী শরীয়তে ই‘তিকাফ ৩ প্রকার।

(ক) ওয়াজিব ই‘তিকাফ : ওলামায়ে কেরামের ঐকমত্যে ওয়াজিব ই‘তিকাফ হলো মানতের ই‘তিকাফ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ ... ﴾ [الحج: ٢٩]

অর্থাৎ “তারা যেন তাদের মানৎ পূর্ণ করে।” (সূরা হাজ্জ : ২৯)

(খ) সুন্নাত ই‘তিকাফ : রমযানের শেষ ১০ দিনের ই‘তিকাফ। সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। যেমন :

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَعْتَكِفُ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানে শেষ দশদিন ইতিকাফ করতেন।’ (বুখারী : ২০২৫; মুসলিম : ১১৭২)

(গ) মুস্তাহাব ই‘তিকাফ : উল্লেখিত দু’প্রকার ব্যতীত বাকী সব মুস্তাহাব ইতেকাফ।

২৫শ অধ্যায়

زكاة الفطر

ফিত্‌রা

প্রশ্ন ১৬১ : ফিত্‌রা কী জিনিস?

উত্তর : রমযান মাসের সিয়ামের ত্রুটি বিচ্যুতির ক্ষতি পূরণার্থে এবং অভাবগ্রস্তদের খাবার প্রদানের উদ্দেশ্যে ঈদের সালাতের পূর্বে নির্ধারিত পরিমানের যে খাদ্য সামগ্রী দান করা হয়ে থাকে- শরীয়াতের পরিভাষায় তাকেই যাকাতুল ফিতর বা ফিত্‌রা বলা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ১৬২ : ফিত্‌রা প্রদানের হুকুম কী?

উত্তর : ফিত্‌রা দেয়া ওয়াজিব।

প্রশ্ন ১৬৩ : কোন ব্যক্তির উপর ফিত্‌রা দেয়া ওয়াজিব?

উত্তর : প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, স্বাধীন-পরাধীন, ধনী-গরীব সকলের উপর ফিত্‌রা দেয়া ওয়াজিব।

প্রশ্ন ১৬৪ : কী পরিমাণ সম্পদ থাকলে ফিতরা দেয়া ফরয হয়?

উ: ঈদের দিন যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি ও তার পরিবারবর্গের প্রয়োজনীয় খাবারের চেয়ে অতিরিক্ত আরো ২ কেজি ৪০ গ্রাম পরিমাণ নির্দিষ্ট খাবার মওজুদ থাকে তাহলে ঐ ব্যক্তি ও তার পরিবারবর্গের সকল সদস্যদের উপর ফিত্‌রা প্রদান ফরয হয়ে যাবে।

(ক) আবদুল্লাহ ইবনে ‘উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাধীন, কৃতদাস, নারী, পুরুষ, ছোট, বড় প্রত্যেক মুসলিমের প্রতি রমাযানের সিয়ামের কারণে এক সা‘আ খেজুর

বা এক সা'আ যব ফিত্‌রা হিসেবে ফরয করে দিয়েছেন। (বুখারী : ১৫০৩; মুসলিম : ৯৮৪)

(খ) আহমাদের একটি বিশুদ্ধ হাদীসে আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে,

فِيْ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حَرِّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى صَغِيْرٍ أَوْ كَبِيْرٍ فَقِيْرٍ أَوْ غَنِيِّ صَاعًا مِنْ تَمَرٍ

প্রত্যেক স্বাধীন, পরাধীন, নারী, পুরুষ ছোট, বড়, ফকীর-ধনী, প্রত্যেকের উপর জনপ্রতি এক সা'আ (২ কেজি ৪০ গ্রাম) পরিমাণ খেজুর ফিত্‌রা হিসেবে দান করা ওয়াজিব।

তবে ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) মতে ঈদের দিন যাকাতের নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে অর্থাৎ ঐদিন ভোরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত হিসেবে যার ঘরে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা বায়ান্ন তোলা রৌপ্য বা এর সমপরিমাণ নগদ অর্থ থাকবে শুধু ঐ পরিবারের উপর ফিত্‌রা দেয়া ফরয হবে।

প্রশ্ন ১৬৫ : যে দরিদ্র ব্যক্তি ফিত্‌রা গ্রহণ করবে সেও কি তার নিজের ও পরিবারের সদস্যদের ফিত্‌রা প্রদান করবে?

উত্তর : না, দিবে না।

প্রশ্ন ১৬৬ : ফিত্‌রা কাকে দিব?

উত্তর : যারা যাকাত খেতে পারে তাদেরকেই ফিত্‌রা দেবেন।

প্রশ্ন ১৬৭ : একাধিক লোকের ফিত্‌রা কি একজন দরিদ্রকে দেয়া জায়েয?

উত্তর : হা, তা জায়েয। অপরদিকে এক ব্যক্তির ফিত্‌রা ভাগ করে একাধিক লোককে দেয়াও জায়েয আছে।

প্রশ্ন ১৬৮ : ফিত্‌রা হিসেবে কী ধরনের খাদ্যদ্রব্য দেয়ার বিধান আছে?

উত্তর : গম, ভুট্টা, যব, খেজুর, কিসমিস, পনির, আটা, চাউল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য।

প্রশ্ন ১৬৯ : প্রতি একজনের উপর কী পরিমাণ ফিত্‌রা দেয়া ফরয?

উত্তর : এক সা'আ পরিমাণ। আলেমদের মতে সা'আর সমপরিমাণ হল ২ কেজি ৪০ গ্রাম।

(ক) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবী আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمَرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أقط أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ

'আমরা ফিত্‌রা দিতাম মাথাপিছু এক সা'আ পরিমাণ খাদ্য বা এক সা'আ যব বা এক সা'আ খেজুর বা এক সা'আ পনির বা এক সা'আ কিসমিস'। (বুখারী : ১৫০৬; মুসলিম : ৯৮৫)

(খ) নাসাঈর অন্য এক হাদীসে আছে

صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ

ফিত্‌রা হচ্ছে এক সা'আ পরিমাণ খাদ্যবস্তু।

এ মাসআলাটি মতবিরোধপূর্ণ। ইমাম আবূ হানিফা (রহ.) বলেছেন, ফিতরার পরিমাণ অর্ধেক সা' অর্থাৎ ১ কেজি ২০ গ্রাম খাদ্যদ্রব্য। উলামায়ে কিরাম অনেক যাচাই বাছাই করে দেখেছেন যে, অর্ধেক সা'

এর পক্ষের অধিকাংশ হাদীসই দুর্বল। সে কারণে সক্ষম ব্যক্তিদের এক সা‘ পরিমাণ ফিত্‌রা প্রদান করাই আমি (লেখক) উত্তম মনে করছি।

প্রশ্ন ১৭০ : খাদ্যদ্রব্য না দিয়ে এর বদলে টাকা পয়সা দিয়ে কি ফিত্‌রা দেয়া জায়েয হবে?

উত্তর : মালিকী, শাফেয়ী ও হাম্বালী এ তিন মাযহাবের ইমামগণ বলেছেন, যেহেতু হাদীসে খাদ্যদ্রব্য দান করতে বলা হয়েছে সেহেতু টাকা পয়সা দিয়ে ফিত্‌রা দিলে তা জায়েয হবে না। কিন্তু কিয়াসের আলোকে হানাফী মাযহাবে টাকা পয়সা দিয়ে ফিত্‌রা দেয়াকে জায়েয বলেছেন। বিবেকের বিশ্লেষণে আপনি যে কোন একটা মত গ্রহণ করতে পারেন।

প্রশ্ন ১৭১ : ফিত্‌রা কোন সময় প্রদান করব?

উত্তর : ফিত্‌রা দেয়ার দু’টি সময় আছে : একটি হল উত্তম সময়, অন্যটি হল বৈধ সময়। উত্তম সময় হল ঈদের দিন ঈদের সালাত আদায় করার পূর্বে ফিত্‌রা প্রদান শেষ করা। আর জায়েয সময় হল ঈদের দু’এক দিন আগেই ফিত্‌রা প্রদান করে ফেলা। ইবনু ‘উমার বলেছেন,

أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের ঈদের সালাত আদায় করার আগেই ফিত্‌রা দিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। (বুখারী : ১৫০৯; মুসলিম : ৯৮৬)

প্রশ্ন ১৭২ : ফিত্‌রা প্রদানের ফরয সময় কখন শুরু হয়?

উত্তর : ঈদের আগের দিন সূর্যাস্তের পর থেকে।

প্রশ্ন ১৭৩ : যদি কোন ব্যক্তি ঈদের সালাত আদায়ের পর ফিত্‌রা প্রদান করে তাহলে কি তা আদায় হবে?

উ: সালাত আদায়ের পূর্বে হলে তা ফিৎরা হিসেবে গণ্য হবে। আর সালাতের পর হলে তা হবে সাধারণ দান। আবদুল্লাহ ইবনু আববাস বর্ণিত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

زَكَاةُ الْفِطْرِ طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطَعْمِهِ لِلْمَسَاكِيْنَ - فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ صَدَقَاتٍ

সিয়াম পালনকারীর অপ্রয়োজনীয় ও বেফাস কথাবার্তা থেকে তাকে পবিত্রকরণ এবং গরীব মিসকীনদের খাবার প্রদানের উদ্দেশ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিত্‌রা প্রদান করাকে ফরয করে দিয়েছেন। অতএব যে ব্যক্তি ঈদের সালাতের আগে তা পরিশোধ করবে সেটা ফিত্‌রা হিসেবে আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে। আর ঈদের সালাতের পর দিলে তা হবে একটা সাধারণ দান খয়রাত। (অর্থাৎ তা ফিত্‌রা হিসেবে গণ্য হবে না)। (আবূ দাউদ : ১৬০৯; ইবনে মাজাহ : ১৮২৭)

প্রশ্ন ১৭৪ : ঈদের দিন সূর্যোদয়ের আগে কোন শিশু জন্ম গ্রহণ করলে তার কি কোন ফিত্‌রা দেয়া লাগবে?

উত্তর : হা, লাগবে। তবে সেদিন সূর্যোদয়ের পর ভূমিষ্ঠ হলে ফিত্‌রা দেয়া লাগবে না। তবে দিয়ে দিলে সাওয়াব হবে। অনুরূপভাবে ঈদের আগের দিন সূর্যাস্তের পূর্বে কেউ ইন্তেকাল করলে তার ফিত্‌রা দিতে হবে না। কিন্তু সেদিন সূর্যাস্তের পর মারা গেলে তার পক্ষে ফিত্‌রা দিতে হবে। কারণ ফিত্‌রা প্রদানের ফরয সময় শুরু হয় ঈদের আগের দিন সূর্যাস্তের পর থেকে।

২৬শ অধ্যায়

ঈদ :

সংজ্ঞা, প্রচলন ও হুকুম আহকাম

প্রশ্ন ১৭৫ : ঈদ অর্থ কী?

উঃ ঈদ অর্থ আনন্দ। এর শাব্দিক অর্থ হলো 'বারবার ফিরে আসা' (عَادَ-يَعُوْدُ-عِيْدًا) এ দিনটি বারবার ফিরে আসে বলে এর নামকরণ হয়েছে ঈদ। আল্লাহ তা'আলা এদিনে তার বান্দাকে নি'আমাত ও অনুগ্রহ দ্বারা বারবার ধন্য করে থাকেন, বারবার ইহসান করেন। রমযানের পানাহার নিষিদ্ধ করার পর আবার পানাহারের আদেশ প্রদান করেন। ফিত্‌রা প্রদান ও গ্রহণ, হজ পালন ও কুরবানীর গোশত ভক্ষণ ইত্যাদি নি'আমাত বছর ঘুরিয়ে তিনি বারবার বান্দাদেরকে ফিরিয়ে দেন। এতে মানুষের প্রাণে আনন্দের সঞ্চার হয়। এসব কারণে এ দিবসের নামকরণ হয়েছে ঈদ।

প্রশ্ন ১৭৬ : ঈদ কোন হিজরীতে শুরু হয়?

উঃ প্রথম হিজরীতেই ঈদ শুরু হয়। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র আগের নাবীদের সময় ঈদের প্রচলন ছিল না।

প্রশ্ন ১৭৭ : ঈদের প্রচলন কীভাবে শুরু হয়?

উঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মাক্কা থেকে মাদীনায় হিজরত করলেন তখন মাদীনাবাসীদের মধ্যে বিশেষ দু'টি দিবস ছিল, সে দিবসে তারা খেলাধুলা করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন এ দু'টি দিনের তাৎপর্য কী? মাদীনাবাসীরা

উত্তর দিল আমরা জাহেলী যুগ থেকে এ দু'দিনে খেলাধুলা করে আসছি। তখন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللهُ خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمُ الأَضْحٰى وَيَوْمُ الْفِطْرِ

আল্লাহ রাববুল 'আলামীন এ দু'দিনের পরিবর্তে এর চেয়েও উত্তম দু'টি দিন তোমাদেরকে দান করেছেন। আর সেই দিন দু'টি হল : ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর। (আবূ দাউদ : ১১৩৪; নাসাঈ : ১৫৫৬)

প্রশ্ন ১৭৮ : ঈদের সালাতের হুকুম কী?

উঃ ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেছেন, ঈদের সালাত প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ওয়াজিব। ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ একই মত পোষণ করেন।

প্রশ্ন ১৭৯ : ঈদের সালাতের আগে আমাদের করণীয় কী কী?

উঃ নিম্নবর্ণিত কাজগুলো করা সুন্নাত/মুস্তাহাব।

১. গোসল করা, পরিষ্কার পোশাক পরিধান করা মুস্তাহাব।

২. ঈদুল ফিতরের দিন খাবার খেয়ে ঈদের সালাতে যাওয়া, আর ঈদুল আযহার দিন না খেয়ে ঈদগাহে যাওয়া সুন্নাত। তাছাড়া ঈদুল আযহার সালাত শেষে কুরবানীর গোশত দিয়ে খাবার গ্রহণ করা সুন্নাত।

৩. ঈদগাহে পায়ে হেটে যাওয়া মুস্তাহাব। আর একপথে যাবে এবং ভিন্ন পথ দিয়ে আবার পায়ে হেটেই আসা সুন্নাত।

৪. তাকবীর পড়া এবং তা বেশি বেশি ও উচ্চস্বরে পড়া সুন্নাত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে ঈদগাহ পর্যন্ত তাকবীর দিতে দিতে যেতেন।

উল্লেখ্য যে, ফজরের সালাতের পর ঈদের সালাতের পূর্বে অন্য কোন নফল সালাত নেই।

প্রশ্ন ১৮০ : ঈদের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী ধরনের পোশাক পরতেন?

উঃ আল্লামা ইবনু কাইয়িম (রহ.) তার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ যাদুল মা'আদে লিখেছেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন উত্তম পোশাক পরিধান করতেন। তাঁর এক জোড়া পোশাক ছিল যা দু' ঈদ ও জুমু'আর দিন পরিধান করতেন। অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

إِنَّ اللهَ تَعَالٰى يُحِبُّ أَنْ يَرى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلٰى عَبْدِهِ

আল্লাহ রাববুল আলামীন তার বান্দার উপর তার প্রদত্ত নি'আমাতের প্রকাশ দেখতে পছন্দ করেন। (তিরমিযী : ২৮১৯)

প্রশ্ন ১৮১ : কোন পুরুষ লোক যদি রেশমী কাপড় পরে তাহলে এর হুকুম কি?

উঃ পুরুষদের জন্য রেশমী কাপড় পরা হারাম। আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বাজার থেকে একটি রেশমী কাপড়ের জুব্বা নিয়ে এলেন এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা দিয়ে বললেন : (হে আল্লাহর রাসূল) আপনি এটি কিনে নিন। ঈদের সময় ও আগত গণ্যমান্য অতিথিদের সাথে সাক্ষাতের সময় এটা পরিধান করবেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

إِنَّمَا هٰذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَخَلاَقَ لَهُ

'এটা ঐ ব্যক্তির পোশাক যে আখিরাতে আল্লাহর কাছে কিছুই পাবে না।' তাছাড়া বর্তমান সিল্ক হিসেবে যেসব কাপড় পাওয়া যায় সেগুলোও রেশমী কাপড়। (বুখারী : ৯৪৮)

১-খাবার গ্রহণ

প্রশ্ন ১৮২ : ঈদের দিন খাবার গ্রহণ বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র সুন্নাত কী ছিল?

উঃ ১. নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন না খেয়ে ঘরে থেকে বের হতেন না। আর ঈদুল আযহার দিন ঈদের সালাত আদায় না করে কোন কিছু খেতেন না।

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لاَ يَغْدُوْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتّٰى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ

২. ঈদুল ফিতরের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর না খেয়ে ঈদগাহে রওয়ানা হতেন না। আনাস বলেন, আর খেজুর খেতেন বেজোড় সংখ্যায় (অর্থাৎ তিনটি, পাঁচটি বা সাতটি এভাবে)। (বুখারী : ৯৫৩)

প্রশ্ন ১৮৩ : ঈদগাহে কখন যাওয়া উত্তম?

উঃ ঈদগাহে তাড়াতাড়ি যাওয়া উচিত যাতে ইমাম সাহেবের কাছাকাছি বসা যায়, প্রথম কাতারে সালাত আদায় করা যায়। তাছাড়া সালাতের জন্য অপেক্ষা করা এসব অতীব সওয়াবের কাজ।

প্রশ্ন ১৮৪ : ঈদের সালাতে যাওয়া-আসায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি পথ ব্যবহার করতেন। একপথে যেতেন, ভিন্ন আর এক পথে বাড়ী ফিরতেন। এর হিকমত কী?

উঃ উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে বিভিন্ন হিকমাত বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন :

১. পথ ভিন্ন ভিন্ন হলে উভয় পথের লোকদের সালাম দেয়া যায় এবং ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করা যায়।

২. মুসলিমদের অবস্থা ও শান শওকত পর্যবেক্ষণ করতে পারা যায়।

৩. গাছপালা তরুলতা ও মাটি মুসল্লীদের পক্ষে স্বাক্ষী হয়ে থাকতে পারে।

প্রশ্ন ১৮৫ : ঈদের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে তাকবীর পড়তে পড়তে যেতেন সেটি কোন তাকবীর?

উঃ তাকবীরটি হল :

اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ

উচ্চারণ : আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

অর্থ : আল্লাহ মহান, আল্লাহ অতিমহান, তিনি ছাড়া সত্যিকার আর কোন মা'বুদ নেই। আল্লাহ মহান আল্লাহ মহান আর সমস্ত প্রশংসা শুধুমাত্র তাঁরই জন্য।

প্রশ্ন ১৮৬ : তাকবীর কীভাবে পড়ব?

উঃ তাকবীর প্রকাশ্যে ও উচ্চস্বরে পড়া সুন্নাত। আর তা বেশি বেশি পড়াও সুন্নাত।

প্রশ্ন ১৮৭ : তাকবীর পাঠ কখন শুরু ও শেষ করব?

উঃ ঈদগাহের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে তাকবীর পাঠ শুরু করবে এবং ইমাম সাহেব সালাত শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করতে থাকবে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ঈদুল ফিত্রের তাকবীর শুরু করবে ঈদের চাঁদ উদিত হওয়ার পর থেকেই। ঈদের সালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর পাঠ করতেন।

২-মেয়েদের ঈদের সালাতে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে

প্রশ্ন ১৮৮ : মেয়েদের কি ঈদের সালাতে যাওয়া জায়েয আছে?

উঃ হ্যা, অবশ্যই। উলামায়ে কিরাম এটাকে জরুরী বলেছেন। তারা যাবে।

পাঁচওয়াক্ত সালাত ও জুমু'আর জামাতে শরীক হওয়ার জন্য মেয়েদেরকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিয়েছেন। আর ঈদের সালাতের যাওয়ার জন্য তাদের নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীসে আছে যে,

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نُخْرِجَ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَائِقَ وَالْحُيْضَ وَذَوَاتِ الْخُدُرِ فَأَمَّا الْحُيْض فَيَعْتَزِلن الصَّلاَةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةِ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللهِ إِحْدَانَا لاَ يَكُوْنُ لَهَا جِلْبَابَ قَالَ لتلبسَهَا أُخْتِهَا

"উম্মে আতীয়াহ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন পরিণত বয়স্কা, ঋতুবতী ও গৃহিনীসহ সকল মহিলাকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সালাতে শরীক হওয়ার জন্য ঘর থেকে বের করে নিয়ে যাই। এমনকি মাসিক হায়েয চলাকালীন মেয়েরাও (ঈদগাহে হাজির হবে। তবে তারা) সালাত আদায় থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু ঈদের কল্যাণকর অবস্থা তারা প্রত্যক্ষ করবে এবং মুসলিমদের সাথে দু'আয় ঋতুবতী মহিলারাও শরীক হবে।

উম্মে আতীয়াহ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের মধ্যে কারো কারো উড়না নেই (বড় চাদর নাই যা পরিধান করে ঈদগাহে যেতে পারে)। উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যার ওড়না নেই

সে তার অন্য বোন থেকে (ধার করে) ওড়না নিয়ে তা পরিধান করে ঈদগাহে যাবে। (মুসলিম : ৮৯০)

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বর্ণিত এ হাদীসে যে ঋতুবতী মহিলার উপর সালাত আদায় ফরজ নয় তাকেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদগাহে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং যার উড়না নেই তাকেও একটা উড়না ধার করে নিয়ে ঈদের সালাতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

এ হাদীস দ্বারা অনেক বিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম মেয়েদের ঈদের সালাতে যাওয়া ওয়াজিব বলেছেন।

যেসব লোক একথা বলেন যে, বর্তমান যুগ ফিতনার যুগ, মেয়েদের নিরাপত্তা নেই এসব কথা বলে মেয়েদেরকে ঈদের সালাত থেকে বঞ্চিত রাখছেন। তাদের এ অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়।

তারা যেন প্রকারান্তরে এ হাদীসের বিরুদ্ধে কথা বলছেন। শেষ যামানার ফিতনা বাড়বে একথা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের চেয়ে বেশি অবগত থাকার পরও মহিলাদেরকে ঈদের সালাতে যেতে হুকুম দিয়েছেন। আর এ হুকুম সুন্নাত নয়, বরং ওয়াজিব।

মেয়েরা ঈদের সালাতে গেলে পথিমধ্যে তাকবীর বলা, সালাতে শরীক হওয়া, বয়ান ও ওয়াজ নসীহত শোনার সৌভাগ্য তাদের হয়ে থাকে। কাজেই ক্ষতির যে আশংকা করা হয় এর চেয়ে তাদের উপকারের দিকই বেশি।

তাই সম্মানিত ঈদগাহ কর্তৃপক্ষের উচিত তারা যেন মেয়েদের জন্য পৃথক প্যান্ডেল তৈরীকরে দেন আর মেয়েরাও যেন সম্পূর্ণ শরয়ী পর্দা করে অত্যন্ত শালীনভাবে পথ চলেন, ঈদগাহে যাওয়া আসা করেন। কাউকে ডিস্টার্ব না করেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে সহীহ হাদীস আমল করার ও হক পথে থাকার তাওফীক দান করুন- আমীন!

৩-ঈদের সালাত শুরু ও শেষ সময়

প্রশ্ন ১৮৯ : ঈদের সালাতের সময় কখন শুরু ও শেষ হয়।

উঃ সূর্যোদয়ের পনর/বিশ মিনিট পর থেকে যোহরের সালাতের পনর/বিশ মিটিন পূর্বে পর্যন্ত ঈদের সালাতের সময় যাকে এ সময়টি সালাতুদ দুহা (অর্থাৎ চাশতের সালাতের) সময়। এ চাশতের সালাত আর ঈদের সালাতের সময় একই।

হাদীসে আছে,

عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي بِنَا الْفِطْرَ وَالشَّمْسَ عَلَى قَيْدِ رَمْحَيْنِ وَالأَضْحَى عَلَى قَيْدِ رَمْحٍ

জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে ঈদুল ফিতরের সালাত আদায় করতেন সূর্য যখন দু’ বর্শা পরিমাণ উপরে উঠত এবং ঈদুল আযহা আদায় করতেন সূর্য যখন এক বর্শা পরিমাণ উপরে উঠত। (ফিকহুস সুন্নাহ : ১/৩১৯)

প্রশ্ন ১৯০ : ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা- এর কোনটি আওয়াল ওয়াক্তে (অর্থাৎ প্রথম ওয়াক্তে) পড়ব?

উঃ ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেছেন,

নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের সালাত একটু দেরী করে আদায় করতেন। আর ঈদুল আযহার সালাত প্রথম ওয়াক্তে তাড়াতাড়ি আদায় করতেন। (যাদুল মা‘আদ)

এ বিষয়ক সকল হাদীস বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, সূর্যোদয়ের পর থেকে দেড় ঘণ্টার মধ্যে ঈদুল আযহা এবং আড়াই ঘণ্টার মধ্যে ঈদুল ফিতর পড়া উত্তম।

প্রশ্ন ১৯১ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের সালাত ঈদুল আযহার সালাতের চেয়ে একটু দেরী করে পড়তেন কেন?

উঃ তুলনামূলক ভাবে ঈদুল ফিতরের সালাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটু দেরী করে পড়তেন এ কারণে যাতে লোকেরা সাদাকাতুল ফিতর (অর্থাৎ ফিত্‌রা) প্রদানের প্রয়োজনীয় কাজগুলো সেরে নিয়ে ঈদগাহে যেতে পারে।

আর ঈদুল আযহা তাড়াতাড়ি প্রথম ওয়াক্তে আদায় করতেন যাতে করে সালাত শেষ করে কুরবানীর পশু জবাইয়ের কাজ সম্পন্ন করতে পারে।

৪-ঈদের সালাতের স্থান

প্রশ্ন ১৯২ : ঈদের সালাত কোথায় আদায় করা সুন্নাত?

উঃ কোন একটা মাঠে ঈদের সালাত আদায় করা সুন্নাত।

প্রশ্ন ১৯৩ : নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় ঈদের সালাত আদায় করতেন?

উঃ যাদুল মা'আদ কিতাবে ইবনুল কায়্যিম (রহ.) লিখেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজীবন ঈদের সালাত ঈদগাহে আদায় করেছেন।

হাদীসে আছে যে,

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى

আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সালাত আদায়ের জন্য ঈদগাহে যেতেন। (বুখারী : ৯৫৬)

প্রশ্ন ১৯৪ : বৃষ্টি, ঝড়-তুফান ও নিরাপত্তহীনতা ইত্যাদি অবস্থায় মাসজিদে ঈদের সালাত আদায় করা কি জায়েয হবে?

উঃ হা, জায়েয আছে।

আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার বৃষ্টি হওয়ায় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে নিয়ে মাসজিদে ঈদের সালাত আদায় করেছিলেন। (আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ মিশকাত)

(অবশ্য নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) এটাকে দুর্বল হাদীস বলেছেন)

৫-ঈদের সালাতে আযান ও ইকামাত নেই

প্রশ্ন ১৯৫ : ঈদের সালাতে কোন আযান ও ইকামাত নেই এ বিষয়ে দলীল আছে কি?

উঃ হাঁ, দলীল আছে।

(১) ইবনে আববাস ও জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তারা বলেন,

لَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنْ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحٰى

(রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র যামানায়) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সালাতে আযান দেয়া হতো না। (বুখারী : ৯৬০)

(২) জাবের ইবনে সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- الْعِيْدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ آذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ

আমি বহুবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র সাথে দু' ঈদের সালাত আদায় করেছি কোন আযান ও ইকামাত ছাড়াই। (মুসলিম : ৮৮৭)

প্রশ্ন ১৯৬ : ঈদের সালাত কত রাকআত?

উঃ দুই রাকা'আত।

উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

صَلاَةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَصَلاَةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلاَةُ الأَضْحَى رَكْعَتَانِ وَصَلاَةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ

জুমু‘আর সালাত দু’ রাক‘আত, ঈদুল ফিতরের সালাত দু’ রাক‘আত, ঈদুল আজহার সালাত দু’ রাক‘আত এবং সফর অবস্থায় (চার রাক‘আত বিশিষ্ট ফরয) সালাত দুই রাক‘আত। (নাসাঈ : ১৪২০)

প্রশ্ন ১৯৭ : এ দু’ রাক‘আত ঈদের সালাতের আগে পরে কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন নফল সুন্নাত সালাত পড়তেন?

উঃ না, ঈদের সালাতের সাথে এর আগে পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন নফল সুন্নাত সালাত আদায় করনে নি। (মুসনাদে আহমাদ)

৬-ঈদের সালাতে ভিতরকার অতিরিক্ত তাকবীর সংখ্যা

প্রশ্ন ১৯৮ : ঈদের সালাতে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বাধার পর “আল্লাহু আকবার বলে অতিরিক্ত যে কিছু তাকবীর দেয়া হয় এর মোট সংখ্যা কত?

উঃ এ বিষয়ে প্রধানতঃ দু’টি মত রয়েছে :

ক. ১ম ও ২য় রাক‘আতে অতিরিক্ত ৩ + ৩ = মোট ৬ তাকবীর। এটি হানাফী মাযহাবের ইমাম আবূ হানিফার (রহ.) মত।

(খ) দ্বিতীয়মত হল :

১ম ও ২য় রাক‘আতে যথাক্রমে অতিরিক্ত ৭ + ৫ = মোট ১২ তাকবীর। এটি বাকী ৩ মাযহাবের মত।

প্রশ্ন ১৯৯ : যারা অতিরিক্ত ৬ তাকবীরে ঈদের সালাত আদায় করেন তাদের দলীল কি?

উঃ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতে ৪ তাকবীরে ঈদের নামাযের স্বপক্ষে একটি হাদীস পাওয়া যায়। একদল ফকীহ এ ৪ তাকবীরকে প্রথম রাকাতে তাকবীরে উলার সাথে ৩ তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাতে রুকুর তাকবীর সহ ৩ তাকবীর-এভাবে অতিরিক্ত ৬ তাকবীরের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। উল্লেখ্য, মুহাদ্দিস আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) এটাকে দুর্বল হাদীস বলেছেন।

প্রশ্ন ২০০ : প্রথম রাকআতে অতিরিক্ত ৭ এবং দ্বিতীয় রাকআতে অতিরিক্ত ৫ তাকবীরে (অর্থাৎ অতিরিক্ত মোট ১২ তাকবীরে) যারা ঈদের সালাত আদায় করে থাকেন তাদের দলীল কি?

উ: (১) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحٰى فِي الأُوْلٰى سَبْعَ تَكْبِيْرَاتٍ وَفِيْ الثَّانِيَةِ خَمْسًا

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সালাতে ১ম রাকআতে (অতিরিক্ত) ৭টি তাকবীর ও ২য় রাকআতে (অতিরিক্ত) ৫টি তাকবীর পাঠ করতেন। (আবূ দাউদ : ১০১৮)

[২] হাদীসে আরো এসেছে :

ابنُ عباس كَبَّرَ فِي العِيْدِ اثْنَتَى عَشَرَةَ تَكْبِيْرَةً سَبْعًا فِي الأُوْلَى وَخَمْسًا فِي الآخِرَةِ

(প্রখ্যাত সাহাবী) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ঈদের সালাতে অতিরিক্ত) ১২ তাকবীর বলেছেন। প্রথম রাকআতে ৭টি এবং দ্বিতীয় রাকআতে ৫টি। (বায়হাকী ৩/৪০৭)

প্রশ্ন ২০১ : অতিরিক্ত ৬ তাকবীর ও ১২ তাকবীরের মধ্যে দলীল হিসেবে কোনটি বেশি শক্তিশালী?

উ: অধিকাংশ আলেম ১২ তাকবীরের মাসআলাকে বেশি শক্তিশালী বলেছেন। তাছাড়া এ মাসআলার উপর আমল করেছেন একই মাযহাবের ইমাম আবূ হানীফার অনুসারী তার দুই ছাত্র ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.)। মালিকী, শাফিঈ‘, হাম্বলী মাযহাব ও আহলে হাদীসের লোকেরা এবং মাক্কা ও মাদীনার ইমামগণ এভাবে অতিরিক্ত ১২ তাকবীরে ঈদের সালাত আদায় করে থাকেন। (রাদ্দুল মুহতার ৬৬৪ পৃঃ)

প্রশ্ন ২০২ : আমরা যারা হানাফী মাযহাবের অনুসারী তারা কি অতিরিক্ত ১২ তাকবীরের মাসআলাটি আমল করতে পারি?

উ: হ্যাঁ, তা আমল করা জায়েয আছে। বিখ্যাত হানাফী মাযহাবের সম্মানিত ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেছেন, কোন মাসআলায় সহীহ হাদীস পাওয়া গেলে তাঁর অনুসারীরা তা আমল করতে পারবে। সে ক্ষেত্রে এটাও তাঁরই মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। তিনি বলেছেন :

إذا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ

“ছহীহ হাদীস পাওয়া গেলে সেটাই আমার মাযহাব বলে গণ্য হবে।”

প্রশ্ন ২০৩ : আল্লাহু আকবার বলে যে অতিরিক্ত তাকবীর দেয়া হয় এর হুকুম কি?

উঃ হানাফী ও মালেকী মাযহাবে বাড়তি তাকবীর বলা ওয়াজিব। এটা ছুটে গেলে সাহু সিজদা দিতে হবে।

পক্ষান্তরে অন্যান্য মাযহাবে বাড়তি তাকবীর বলা সুন্নাত।

প্রশ্ন ২০৪ : বাড়তি তাকবীর বলার সময় প্রত্যেক তাকবীরেই কি হাত উঠাতে হবে?

উঃ হ্যাঁ। দ্বিতীয় খলীফা উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু জানাযা ও ঈদের সালাতে প্রত্যেক তাকবীরে দু'হাত তুলতেন। (বায়হাকী)

প্রশ্ন ২০৫ : প্রত্যেক তাকবীর বলার সময় কোন পর্যন্ত হাত তুলতে হয়?

উঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর বলার সয়ম দু' হাত তাঁর কাঁধ বা কান পর্যন্ত তুলতেন।

প্রশ্ন ২০৬ : অতিরিক্ত তাকবীরগুলো কখন বলতে হয়?

উঃ এ প্রশ্নেও মতবিরোধ রয়েছে।

[ক] প্রথম মত ৬ তাকবীরের মাসআলা :

সালাতে দাড়িয়ে নিয়ত করে তাকবীরের তাহরীমা বাঁধার পর অতিরিক্ত আরো ৩ তাকবীর দিবে এবং ২য় রাক'আতে কিরা'আত শেষ হলে রুকুর পূর্বে বাড়তি আরো ৩ তাকবীর দেবে। অবশেষে ৪র্থ তাকবীর দিয়ে রুকুতে চলে যাবে।

[খ] দ্বিতীয় মত ১২ তাকবীরের মাসআলা :

প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা (আল্লাহু আকবার) বলার পর অতিরিক্ত আরো ৭ বার তাকবীর বলবে এবং দ্বিতীয় রাক'আতের শুরুতেও সূরা ফাতেহা পড়ার আগেই অতিরিক্ত আরো ৫ বার তাকবীর বলবে।

সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,

شَهِدْتُ الأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الأُوْلَى سَبْعَ تَكْبِيْرَات قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيْرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ

আমি ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সালাত (সাহাবী) আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সাথে আদায় করেছি। তাতে তিনি প্রথম রাকাআতে কিরআত পাঠ (অর্থাৎ সূরা ফাতিহা শুরু) করার আগেই ৭ (সাত) তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকআতে (একই নিয়মে) কিরাআত পাঠ করার পূর্বেই ৫ (পাঁচ) তাকবীর বলতেন। (বায়হাকী : ৩/৪০৬)

ইমাম বায়হাকী বলেছেন, এটাই সুন্নাতী নিয়ম।

প্রশ্ন ২০৭ : অতিরিক্ত তাকবীর বলার ক্ষেত্রে প্রতি দু' তাকবীরের মাঝখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কোন কিছু পড়তেন?

উ: না, তখন তিনি চুপ থাকতেন।

প্রশ্ন ২০৮ : অতিরিক্ত তাকবীর বলার সময় হাত বাঁধবে নাকি ছেড়ে দেবে?

উ: হাত বেঁধে ফেলবেন।

৭-ঈদের সালাত আদায়ের পদ্ধতি

প্রশ্ন ২০৯ : শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কীভাবে ঈদের সালাত আদায় করব?

উঃ **(ক) প্রথম নিয়ম :**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়ে ঈদগাহে যাওয়ার সময় একটি লাঠি বা বল্লম বয়ে নিয়ে যাওয়া হত এবং সালাত শুরুর আগেই সেটা তার সমনে 'সুতরা' হিসেবে মাটিতে গেড়ে দেয়া হত। (বুখারী পৃঃ ১৩৩)

অতঃপর তিনি (নিয়ত করে) 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীরে তাহরীমা বলে হাত বাঁধতেন। এরপর তিনি 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা.........'' পড়তেন। (ইবনে খুযাইমা)

তারপর সূরা ফাতিহা পড়ার পূর্বেই তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একের পর এক মোট ৭ বার তাকবীর দিতেন (অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলতেন)। প্রতি দু' তাকবীরের মাঝখানে তিনি একটুখানি চুপ থাকতেন। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র সুন্নাত অনুসরণের অধিক পাবন্দি হওয়ার কারণে প্রত্যেক তাকবীরের সাথে দু' হাত তুলতেন এবং প্রত্যেক তাকবীরের পর আবার হাত বেঁধে ফেলতেন। (বায়হাকী)

এভাবে ৭টি তাকবীর বলার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ফাতিহা পড়তেন। এরপর তিনি আরেকটি সুরা মিলিয়ে পড়তেন। এরপর তিনি রুকুও সিজদা করতেন।

এভাবে প্রথম রাক'আত শেষ করার পর সাজদাহ থেকে উঠে (সূরা ফাতিহা শুরুর পূর্বেই) তিনি (২য় রাকাতে) পরপর ৫টি তাকবীর

দিতেন। তারপর সূরা ফাতিহা পড়ে আরেকটি সূরা পড়তেন। এরপর তিনি রুকু ও সাজদাহ করে দু' রাক'আত ঈদের সালাত শেষ করতেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি একটি তীরের উপর ভর দিয়ে যমীনে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। তখন ঈদগাহে কোন মিম্বর নেয়া হত না। তারপর দু'আ করে শেষ করে দিতেন। (যাদুল মা'আত ১ম খণ্ড)

(খ) দ্বিতীয় নিয়ম :

দ্বিতীয় নিয়মটি প্রথমটির মতই। শুধু পার্থক্য হল ১ম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমার পর অতিরিক্ত ৩ তাকবীর বলবে এবং এর প্রথম দু' তাকবীরে হাত ছেড়ে দেবে এবং শেষ তাকবীরে হাত বেঁধে ফেলবে।

আর দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা শেষে রুকুর পূর্বে অতিরিক্ত ৩ তাকবীর দেবে এবং প্রত্যেক তাকবীরেই হাত ছেড়ে দেবে। অতঃপর ৪র্থ তাকবীর বলে রুকুতে চলে যাবে। আর বাকী সব নিয়মকানুন একই।

প্রশ্ন ২১০ : সলাতুল ঈদে সূরা ফাতিহা পড়ার পর কোন সূরা পড়া মুসতাহাব?

উঃ প্রথম রাক'আতে সূরা আলা এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা গাশিয়াহ পড়া। অথবা

প্রথম রাক'আতে সূরা কাফ এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা কামার পড়া। (মুসলিম : ৮৯১)

এভাবে পড়া মুস্তাহাব। না পারলে যেকোন সূরা দিয়ে পড়া জায়েয আছে। এতে কোন ক্ষতি নেই।

৮-ঈদের খুৎবা

প্রশ্ন ২১১: ঈদের খুৎবা কখন দিতে হয়?

উঃ সালাত শেষে সালাম ফিরানোর পর (আর জুমু'আর খুৎবা দিতে হয় সালাতের আগে)। (মুসলিম)

প্রশ্ন ২১২ : ঈদের খুৎবা শ্রবণ ফরয, ওয়াজিব নাকি মুস্তাহাব?

উঃ মুস্তাহাব। আর জুমু'আর খুৎবা শোনা ওয়াজিব। তবে যারা ঈদের খুৎবা না শুনে চলে যাবে তাদের গোনাহ না হলেও তারা ঈদের গুরুত্বপূর্ণ দু'আ ও ফযীলত থেকে বঞ্চিত হবে।

প্রশ্ন ২১৩ : কি শব্দ দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুৎবা শুরু করতেন?

উঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত খুৎবাই "আলহামদু লিল্লাহ" বাক্য দ্বারা শুরু করতেন।

প্রশ্ন ২১৪ : ঈদের খুৎবায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলতেন?

উঃ প্রথমে তিনি সালাত শেষে মুসুল্লীদের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন। অতঃপর খুৎবা দেয়া শুরু করতেন। খুৎবাতে তিনি ওয়াজ-নসীহত করতেন, উপদেশ দিতেন এবং বিভিন্ন নির্দেশও দিতেন। আর এ অবস্থায় মানুষেরা তাদের কাতারে বসে থাকত। (বুখারী)

ইমাম নববী (রহ.) বলেন, ঈদুল ফিতরে খুৎবায় ফিত্‌রা এবং ঈদুল আযহার খুৎবায় কুরবানী মাসআলা-মাসায়েল আলোচনা করা উচিত।

প্রশ্ন ২১৫ : খুৎবা কি একটি ধরাবাধা গদ? যা ইমাম সাহেব ঈদগাহে পড়বেন?

উঃ না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুগের চাহিদা অনুসারে সময়োপযোগী বক্তৃতা করতেন। ঐ বৃক্তৃতাই ছিল খুৎবা। আমাদেরও তাই করা উচিত। এজন্য সুন্নাত হলো খুৎবা দেয়া, খুৎবা দেখে দেখে পড়া নয়।

প্রশ্ন ২১৬ : খুৎবা কি বাংলায় দেয়া জায়েয হবে?

উঃ হা, তা জায়েয আছে।

হারামাইন শরীফাইনের ইমাম শেখ আবদুল্লাহ সুবাইল বলেছেন, প্রত্যেক জাতি তার নিজের ভাষায় খুৎবা দিবে। যাতে খুৎবায় যে উপদেশ দেয়া হয় তা যেন মুসল্লীরা বুঝতে পারে, উপকৃত হতে পারে।

টিভি চ্যানেল এটিএন বাংলার ইসলামী অনুষ্ঠানের প্রধান আলোচক দেশ বরেণ্য আলেম অধ্যক্ষ সাইয়্যেদ কামালুদ্দীন জাফরী ঢাকাস্থ উত্তরার আযমপুরস্থ কেন্দ্রীয় ঈদগাহ জামে মাসজিদে বাংলায় খুৎবা দিয়ে থাকেন।

তাছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় এখন কিছু কিছু মাসজিদে বাংলায় খুৎবা দেয়া শুরু হয়েছে।

প্রশ্ন ২১৭ : ঈদের খুৎবা শেষে দু‘আ কি ইমাম সাহেবের সাথে জামাতবদ্ধভাবে নাকি একাকী-কোনটি সুন্নাত তরীকা?

উঃ সুন্নাত হলো একাকী মুনাজাত করা। ফরয, জুমু‘আ ও ঈদের সালাতের পর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে কখনো ইমামের সাথ জামাতবদ্ধভাবে দু‘আ করেননি। তবে বৃষ্টির সালাত,

কুনূতে নাযিলা ও বিতরের সালাতের শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমাম ও মুক্তাদীরা জামাতবদ্ধ হয়ে দু‘আ মুনাজাত করেছেন।

আর ফরয সালাতের পর যেহেতু দু‘আ কবূল হয় সেহেতু আমাদেরও উচিত নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত তারীকায় একাকী মুনাজাত করা। আর হৃদয়ের সমস্ত আবেদন নিবেদন ও হাজত সে মুহূর্তে আল্লাহর কাছে পেশ করা। চট্টগ্রামের হাটহাজারী কওমী মাদরাসা, টঙ্গীর বিশ্ব এজতেমা, নরসিংদীর জামেয়া কাসেমিয়া কামিল মাদরাসা, একই জেলার রায়পুরাস্থ সিরাজ নগর উম্মুল কুরা মাদরাসা, ও মাক্কা-মদীনায় ইমাম-মুক্তাদীগণ ফরয সালাতের শেষে সম্মিলিত দু‘আ করেন না। প্রত্যেকে একাকী দু‘আ করে থাকেন। আর এটাই হল সুন্নাত তরীকা।

৯-ঈদের জামাআত না পেলে

প্রশ্ন ২১৮ : ঈদের জামাআত না পেলে কি করব? কাযা আদায় করতে হবে কি?

উঃ অনেক বিজ্ঞ উলামায়ে কিরামের মতে দু’ রাকআত কাযা আদায় করতে হবে।

অপরদিকে আমাদের হানাফী মাযহাবের ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেছেন, ঈদের সালাত ধরতে না পারলে ইচ্ছা করলে কাযা আদায় করতে পারে। আর না করলেও কোন অসুবিধা নেই। যদি আদায় করে তবে চার রাক‘আতও আদায় করতে পারে, আবার দু’ রাক‘আতও পারে।

যে ব্যক্তি জামাত পাবে না সে একাও পড়তে পারে, আবার দু’ তিনজন পুরুষ বা নারী হোক তাদেরকে নিয়ে জামাতেও পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে খুৎবা দেয়া প্রয়োজন নেই।

একবার আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ঈদের জামাআত না পেয়ে নিজ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে দু’রাক‘আতে সালাত আদায় করেছিলেন। (বুখারী)

জামা‘আতে যদি এক রাক‘আত কম পায় তাহলে বাকী এক রাক‘আত নিজে নিজে পড়ে নিবে।

১০-ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়

প্রশ্ন ২১৯ : ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়ের নির্দিষ্ট কোন পরিভাষা আছে কি?

উঃ হ্যাঁ, সাহাবায়ে কিরাম ঈদের দিন শুভেচ্ছা বিনিময়ে একে অপরকে বলতেন :

تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ

“আল্লহ তা‘আলা আমাদের ও আপনার ভাল কাজ কবূল করুন।” (ফতহুল বারী)

এছাড়াও বলা যেতে পারে :

كُلَّ عَام وَأَنْتُمْ بِخَيْرٍ

প্রতি বছরই আপনারা ভাল থাকুন।

অথবাঃ

(عِيْدٌ سَعِيْدٌ) عِيْدٌ مُبَارَكٌ

ঈদ মোবারক (আপনাকে বরকতময় ঈদের শুভেচ্ছা)।

প্রশ্ন ২২০ : ঈদের সালাত থেকে বাড়ী ফিরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে কোন কাজটি করতেন?

উঃ দু'রাকাত নফল সালাত আদায় করতেন। সাহাবী আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,

أَنَّهُ كَانَ لاَ يُصَلِّيْ قَبْلَ الْعِيْدِ شَيْئًا فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঈদের দিন ফজরের সালাতের পর থেকে) ঈদের সালাতের পূর্ব পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে কোন প্রকার সুন্নাত নফল সালাত পড়েন নি। (ঈদগাহ থেকে) বাড়ী ফিরেই তিনি প্রথমে দু'রাক'আত (সুন্নাত) সালাত আদায় করতেন। (ইবন মাজাহ : ১২৯৩)

উল্লেখ্য যে, ঈদের সময় আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতে বেড়াতে যাওয়া, তাদের খোঁজ খবর নেয়া, তাদেরকে দাওয়াত দেয়া এগুলো উত্তম ইবাদত।

১১-ঈদে যা বর্জনীয়

প্রশ্ন ২২১ : পবিত্র ঈদের কল্যাণ হাসিলের জন্য কী ধরণের কাজ থেকে সতর্ক থাকা উচিত?

উঃ নিম্নবর্ণিত পাপাচার থেকে দূরে থাকা ফরয :

(১) অমুসলিমদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পোশাক পরিধান করা ও আচার-আচরণ করা।

(২) ছেলেরা মেয়েদের এবং মেয়েরা ছেলেদের বেশ ধারণ।

(৩) বেগানা নারী পুরুষ একত্রে দেখা সাক্ষাৎ করা।

(৪) মহিলাদের বেপর্দা ও খোলামেলা অবস্থায় রাস্তাঘাট ও বাজার বন্দরে চলাফেলা করা।

৫. গানবাদ্য করা ও সিনেমা-নাটক দেখা।

প্রশ্ন ২২২ : কারো পোশাক যদি অন্য ধর্মীয় লোকদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহলে এর হুকুম কি?

উঃ এটা হারাম।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"যে কেউ অন্য জাতির অনুসরণ করবে সে সে ঐ কওমের (বা ধর্মের) লোক বলে বিবেচিত হবে।" (আবূ দাউদ : ৪০৩১)

প্রশ্ন ২২৩ : পোশাক-আশাক, চুলটাকা ও চালচলনে মেয়েরা ছেলেদের এবং ছেলেরা মেয়েদের অনুসরণ করলে এর হুকুম কি?

উঃ এ ধরনের ছেলে ও মেয়েদেরকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন। (বুখারী ৫৮৮৪)

প্রশ্ন ২২৪ : যেসব মেয়ে বেপর্দা অবস্থায় দোকানপাট ও রাস্তাঘাটে বের হয় তাদের সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেছেন?

উঃ আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سَيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُؤُوْسُهُنَّ كَأَسْنمَة الْبَخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيْحَهَا وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةٍ كَذَا وَكَذَا

দু’ ধরনের লোক দুনিয়ায় আসবে যাদেরকে আমি এখনো দেখতে পাইনি (আমার যুগের পরে তাদের আগমন) এদের একদল লোক যাদের সাথে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক থাকবে, তা দিয়ে তারা লোকজনকে প্রহার করতে থাকবে। আর একদল লোক হবে এমন মেয়েলোক যারা পোশাক পরিধান করেও উলঙ্গ মানুষের মত থাকবে, অন্য পুরুষকে নিজের দিকে আকর্ষণ করবে, অন্যরা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েও যাবে, তাদের মাথার চুলের অবস্থা হবে উটের হেলে পড়া কুঁজের মত। ঐসব মেয়েরা জান্নাতেতো প্রবেশ করবেই না, এমনকি জান্নাতের সুগন্ধিও তারা পাবে না যদিও জান্নাতের সুগন্ধী বহুদূর থেকে পাওয়া যায়। (মুসলিম : ২১২৮)

প্রশ্ন ২২৫ : দেবরেরা কি ভাবীর সাথে দেখা করতে পারবে?

উঃ না। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, اَلْحَمْوُ الْمَوْتُ “দেবর-ভাসুর মৃত্যু সমতুল্য ভয়ানক বিষয়।” অর্থাৎ মৃত্যু যেমন জীবনের জন্য ভয়ানক, অনুরূপভাবে চাচাতো, মামাতো, খালাতো, ফুফাতো ভাইবোন ও দেবর ভাবী ও শালিকা -দুলাভাইয়ের সাক্ষাত ঈমান আমলের জন্য তদ্রূপ ভয়ানক।

প্রশ্ন ২২৬ : ইসলামে গান বাদ্যের হুকুম কি? যাতে ঈদের সময় মানুষকে আরো বেশি লিপ্ত হতে দেখা যায়?

উঃ গান ও বাদ্যযন্ত্র শরী‘আতে নিষিদ্ধ। এটা সম্পূর্ণ হারাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

"আমার উম্মাতের মধ্যে এমন একদল লোক থাকবে যারা যেনা-ব্যভিচার, রেশমী পোশাক পরিধান, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল (বৈধ) মনে করবে। (বুখারী : ৫৫৯০)

২৭শ অধ্যায়

নফল সিয়াম

প্রশ্ন ২২৭ : সুন্নাত ও নফল সিয়ামের মর্যাদা কেমন?

উত্তর : এ জাতীয় সিয়াম পালন করলে প্রচুর সাওয়াব অর্জিত হয়। আর না করলে কোন গুনাহ হয় না।

প্রশ্ন ২২৮ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি নিয়মিত সুন্নাত ও নফল সিয়াম পালন করতেন?

উত্তর : না নিয়মিত করেন নি। কিন্তু যখন সিয়াম শুরু করতেন তখন বিরতিহীনভাবে পালন করতেন। সাহাবারা তখন মনে করতেন সুন্নাত সিয়াম বোধ হয় আর ত্যাগ করবেন না। আবার যখন সিয়াম পরিত্যাগ করতেন তখন সাহাবাদের মনে হতো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বোধ হয় আর এসব সিয়াম পালন করবেন না।

প্রশ্ন ২২৯ : নফল সিয়াম কোন মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশি করতেন?

উত্তর : শাবান মাসে।

প্রশ্ন ২৩০ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জীবনে কী কী সুন্নাত ও নফল সিয়াম পালন করেছেন?

উত্তর : নিম্ন বর্ণিত সিয়াম তিনি পালন করছেন :

১. শাওয়াল মাসের ৬টি রোযা

২. যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশকের সিয়াম

৩. আরাফার দিনের সওম

৪. মুহররম মাসের সওম

৫. আশুরার সিয়াম

৬. শাবান মাসের সওম

৭. প্রতি মাসে ৩ দিন সিয়াম

৮. সোমবার ও বৃহস্পতিবার সিয়াম

৯. একদিন পর পর সিয়াম

১০. বিবাহে অসমর্থদের সিয়াম।

১-শাওয়াল মাসের ৬টি রোযা :

প্রশ্ন ২৩১ : শাওয়াল মাসের ৬টি সিয়াম পালনের ফযীলত জানতে চাই।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

“যে ব্যক্তি রমযান মাসে ফরয সিয়াম পালন করল, অতঃপর শাওয়াল মাসেও আরো ৬ দিন সওম পালন করল সে ব্যক্তি যেন সারা বছর ধরে রোযা রাখল।” (মুসলিম : ১১৬৪)

প্রশ্ন ২৩২ : কোন উযরবশত যদি ফরয রোযা কাযা হয়ে যায় তাহলে কাযা রোযা আগে রাখবে নাকি সুন্নাতের ৬ রোযা আগে রাখবে?

উত্তর : কাযা রোযা আগে রাখবে।

প্রশ্ন ২৩৩ : শাওয়ালের ৬টি রোযা কি একাধারে রাখব, নাকি মাঝে বিরতি দেয়া যাবে?

উত্তর : মাঝখানে বিরতি দেয়া যাবে। তবে একাধারে বিরতিহীনভাবে রাখলে সাওয়াব বেশি পাবে।

প্রশ্ন ২৩৪ : শাওয়ালে ৬টি রোযা উক্ত মাসে আদায় করতে পারে নি। পরের মাসে এগুলো কাযা করতে পারবে কি?

উত্তর : না, এ সুন্নাত সিয়াম কাযা করার নিয়ম নাই।

২-যিলহাজ্জ মাসের ১ম দশকের সিয়াম

প্রশ্ন ২৩৫ : যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশকের দিনগুলোতে সিয়াম পালন ও অন্যান্য ইবাদতের ফযীলত জানতে চাই।

উত্তর : এ দিনগুলোতে কৃত ইবাদতের ফযীলত সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هٰذِهِ الأَيَّامِ الْعَشْرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَقَالَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ رَجُلاً خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذٰلِكَ بِشَيْءٍ

যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের ইবাদত আল্লাহর কাছে কাছে এত বেশি প্রিয় ও মর্যাদাসম্পন্ন যার সমতুল্য বছরে আর কোন দিন নেই। এ কথা শুনে সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, “হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাও কি এর কক্ষ হবে না?” রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর করলেন, “না, তাও হবে না।” তবে সে ব্যক্তি জিহাদে গিয়েছে, এ কাজে অর্থ ব্যয় করেছে, জীবন ও বিলিয়ে দিয়েছে (জান ও মাল সবকিছু বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর কাছে চলে গেছে, বাড়ীতে পরিবার-পরিজনের কাজে) আর ফিরে আসতে পারে নি, অবশ্য তার পুরস্কার ভিন্ন। (আহমাদ : ১৯৬৯)

৩-আরাফার দিনের সিয়াম

প্রশ্ন ২৩৬ : আরাফার দিন কোনটি?

উত্তর : যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ যেদিন হাজীরা আরাফাতের মাঠে সমবেত হন।

প্রশ্ন ২৩৭ : আরাফার দিনে সওম পালনকারীকে আল্লাহ কী পুরস্কার দেবেন?

উত্তর : এ বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

صِيَامُ يَوْمُ عَرَفَةٍ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِيْ بَعْدَهُ

আরাফার দিনের সওম সম্পর্কে আল্লাহর কাছে আশা করি যে, তা বিগত একবছর ও আগামী একবছর (এ দুই বছর)'র পাপের কাফফারা হিসেবে গ্রহণ করা হবে। (মুসলিম : ১১৬২)

প্রশ্ন ২৩৮ : যারা আরাফাতের মাঠে হাজ্জ পালনরত থাকবে তারাও কি এ সওম পালন করবে?

উত্তর : না, তারা এ সওম পালন করবে না। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজ্জ পালন অবস্থায় এ দিনে রোযা রাখেননি। হাজ্জের পরবর্তী কার্যক্রম সম্পাদরেন শক্তি অর্জনের জন্য এ দিনে হাজীদের রোযা না রাখার মধ্যে সওয়াব বেশি।

৪-মুহাররম মাসের সওম

প্রশ্ন ২৩৯ : মুহাররম মাসের সওমের ফযীলত কি?

উত্তর : এ বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمِ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ

রমযান মাসের পর সর্বোত্তম সওম হল আল্লাহর মাস মুহাররমের সওম। আর ফরয সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হল রাতের সালাত (অর্থাৎ তাহাজ্জুদের সালাত)। (মুসলিম : ১১৬৩)

এ মাসে অধিক পরিমাণে নফল সওম পালন করা উত্তম। তবে পূর্ণ মাস নয়।

৫-আশুরার সওম

প্রশ্ন ২৪০ : আশুরার দিন কোনটি?

উত্তর : চান্দ্রমাস মুহাররমের দশ তারিখ।

প্রশ্ন ২৪১ : আশুরার দিনের সওমের ফযীলত?

উত্তর : (ক) সাহাবী আবূ কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ؟ فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ»

এক প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার মর্মার্থ হলো : আশুরার একদিনের সওম বিগত এক বছরের গুনাহের কাফফারা হিসেবে গৃহীত হয়। (মুসলিম : ১১৬২)

(খ) আবূ কাতাদাহ থেকে বর্ণিত অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

صِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ

আমি আশা করছি, আশুরার দিনের সওমকে আল্লাহ তা'আলা বিগত এক বছরের গুনাহের কাফফারা হিসেবে গ্রহণ করে নেবেন। (মুসলিম : ১১৬২)

প্রশ্ন ২৪২ : আশুরার রোযা মুহাররমের ১০ তারিখে শুধু একদিন রাখলেই কি যথেষ্ট হবে?

উত্তর : না, তা যথেষ্ট নয়। ৯ ও ১০ তারিখ এ দু'দিন রাখা উত্তম। অথবা ১০ ও ১১ তারিখেও রাখা যায়। শুধুমাত্র ১০ তারিখে রোযা রাখাকে উলামায়ে কিরাম মাকরূহ বলেছেন।

(ক) ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ

যখন থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরার সওম পালন শুরু করলেন এবং অন্যদেরকেও এ সওম পালনের নির্দেশ দিলেন তখন সাহাবারা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলে উঠলেন, এটাতো ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের সম্মান করার দিন। (একই দিনে সওম পালন করলে আমরা কি তাদের সাদৃশ্য বনে যাবো না?) উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (বেঁচে থাকলে) ইনশাআল্লাহ আগামী বছর (১০ তারিখের সাথে) ৯ তারিখেও সওম পালন করব। (ফলে আমাদের ইবাদত অমুসলিমদের সাথে আর সামঞ্জসপূর্ণ হবে না)। কিন্তু পরবর্তী বছর আসার আগেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেছিলেন। (মুসলিম : ১১৩৪)

(খ) অন্য আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

صُوْمُوْا يَوْمَ عَاشُوْرَاء وَخَالِفُوْا فِيْهِ الْيَهُوْدَ، وَصُوْمُوْا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا

তোমরা আশুরার দিবসে সওম পালন কর এবং ইয়াহূদীদের সওম পালনের পদ্ধতির সাথে মিল না রেখে ভিন্নতরভাবে তা পালন কর। আর সেজন্য তোমরা আশুরার দিনের সাথে ৯ অথবা ১১ তারিখে আরো একটি দিন মিলিয়ে ২ দিন পালন কর। (আহমাদ : ১/২৪১ দুর্বল সূত্রে বর্ণিত)

প্রশ্ন ২৪৩ : আশুরার সওম পালনের এত সাওয়াব কি ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু'র শহীদ হওয়ার কারণে?

উত্তর : না, সেজন্য নয়। বরং আশুরার এ দিনটি পূর্ববর্তী যামানার নাবীদের সময় থেকেই অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও ফযীলতপূণ দিন হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। এ দিনে মূসা (আঃ)কে ফিরআউনের হাত থেকে আল্লাহ রক্ষা করেছিলেন। তবে এ দিনের অনেক কাহিনী শোনা যায় যার কিছু হল দুর্বল, আর বেশির ভাগই তথ্য নির্ভর নয়। এরপরও এ দিনটি আল্লাহর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদা সম্পন্ন।

৬- প্রতি চন্দ্রমাসে ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে সিয়াম

প্রশ্ন ২৪৫ : বর্ণিত এ ৩ দিনের সিয়াম পালনের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে,

أَوْصَانِيْ خَلِيلِيْ -صلى الله عليه وسلم- بِثَلاَثٍ : صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ

আমার বন্ধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ৩টি বিষয় আমল করতে আমাকে উপদেশ দিয়েছেন। সেগুলো হলো (১) প্রত্যেক (চন্দ্র মাসে) ৩ দিন সিয়াম পালন করা, (২) দুপুর হওয়ার পূর্বে দু'রাক'আত 'সলাতুদ দুহা' আদায় করা এবং (৩) নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে বিতরের সালাত আদায় করা। (বুখারী : ১৯৮১; মুসলিম : ৭২১)

প্রশ্ন ২৪৬ : এ ৩ দিনের সিয়াম পালনের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী কী ফযীলত বর্ণনা করেছেন?

উত্তর : আবূ কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে

صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ صَوْمُ الدَّهْرِ

প্রত্যেক মাসে ৩ দিন সিয়াম এবং এক রমযান থেকে আরেক রমযান পর্যন্ত সিয়াম পালন করলে পূর্ণ বছর সিয়াম আদায়ের সমপরিমাণ সাওয়াব আমলনামায় লিপিবদ্ধ হয়। (মুসলিম : ১১৬২)

প্রশ্ন ২৪৭ : প্রতি চন্দ্র মাসের কোন ৩ দিন এ সিয়াম পালন করব তা কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ধারিত করে দিয়েছেন?

উত্তর : হ্যাঁ, সে দিনগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করে দিয়েছেন আবূ যার গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এভাবে বলেছেন :

يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلاَثَ عَشَرَةَ وَأَرْبَعَ عَشَرَةَ وَخَمْسَ عَشَرَةَ.

হে আবূ যার, যদি তুমি প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম পালন করতে চাও তাহলে (প্রতি চাঁদের) তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখে তা পালন কর। (তিরযিমী : ৭৬১)

এ ৩ দিনকে শরীয়াতের পরিভাষায় "আইয়ামুল বীদ" বলা হয়। বীদ অর্থ সাদা বা আলোকিত। কারণ এ ৩ দিনের রজনীগুলো ফুটফুটে চাঁদের আলোতে উদ্ভাসিত থাকে।

প্রশ্ন ২৪৮ : এ ৩ দিনের সিয়াম পালন তো সুন্নাত। কাজেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে কতটুকু গুরুত্ব দিতেন?

উত্তর : ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে,

كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لاَ يُفْطِرُ أَيَّامَ الْبِيْضِ فِي سَفَرٍ وَلاَ فِي حَضَرٍ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে হোক বা নিজ বাড়ীতে হোক- এ দু হালতের কোন অবস্থাতেই আইয়্যামুল বীদের এ ৩ দিনের সিয়াম কখনো ত্যাগ করতেন না। (নাসাঈ)

৭-সাপ্তাহিক সোম ও বৃহস্পতিবারের সিয়াম

প্রশ্ন ২৪৯ : সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবার- এ দু'দিন সিয়াম পালন করা সুন্নাত। কিন্তু প্রশ্ন হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন এ দু'দিন রোযা রাখতে পছন্দ করতেন?

উত্তর : (ক) আবূ কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সোমবারে রোযা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি এর উত্তরে বলেছিলেন,

ذَلِكَ يَوْم وُلِدَتْ فِيْهِ وَيَوْم بِعْثَتٍ فِيْهِ أَوْ أُنْزِلَ عَلَى فِيْهِ

"এ দিনে আমার জন্ম হয়েছে এবং এ দিনে আমাকে নবুওয়াত দেয়া হয়েছে বা আমার উপর কুরআন নাযিল শুরু হয়েছে।" (মুসলিম : ১১৬২)

(খ) অন্য আরেক হাদীসে আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ

(প্রত্যেক সপ্তাহে) সোমবার ও বৃহস্পতিবার বান্দার আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়ে থাকে। কাজেই আমি রোযাদার অবস্থায় আমার আমলগুলো আল্লাহর দরবারে পেশ করা হোক এমনটি আমি পছন্দ করছি। (তিরমিযী : ৭৪৭)

(গ) মা আয়িশা বলেছেন,

أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবার সিয়াম পালনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতেন। (নাসাঈ : ২৩৬০; তিরমিযী : ৭৪৫)

৮-শাবান মাসের সিয়াম

প্রশ্ন ২৪৪ : শাবান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি পরিমাণ সিয়াম পালন করতেন?

উত্তর : আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلاَّ رَمَضَانَ، وَماَ رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِيْ شَعْبَانَ

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে শাবান মাস ব্যতীত অন্য মাসে এত অধিক পরিমাণে নফল সিয়াম পালন করতে দেখিনি। (বুখারী ১৯৬৯)

৯-এক দিন পর পর সিয়াম

প্রশ্ন ২৫০ : আল্লাহর নাবী দাঊদ আলাইহিস সালাম কীভাবে সওম পালন করতেন?

উত্তর : (ক) এ বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَكَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا

“আল্লাহর কাছে (নফল সিয়ামের মধ্যে) সবচেয়ে প্রিয় সিয়াম হল দাঊদ আলাইহিস সালাম’র সিয়াম। তিনি একদিন সিয়াম পালন করতেন, আর এক দিন সিয়াম ত্যাগ করতেন। (মুসলিম : ১১৫৯)

(খ) অন্য আরেক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে মাসে ৩ দিন রোযা রাখতে বললে সে বলল, আমি এর চেয়েও বেশি রোযা পালনে সক্ষম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন,

صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الصِّيَامِ صَوْمُ أَخِيْ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

"তাহলে একদিন সিয়াম পালন কর ও একদিন ভঙ্গ কর। কেননা এটাই সর্বোত্তম সিয়াম যা আমার নবুওয়তী ভাই পয়গাম্বর দাউদ আলাইহিস সালাম পালন করতেন।" (বুখারী : ৩৪১৮; মুসলিম : ১১৫৯)

১০-বিবাহে অসমর্থ যুবকদের সিয়াম

প্রশ্ন ২৫১ : বিবাহে অসমর্থ যুবকদের উদ্দেশ্যে মহানাবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ শুনতে চাই।

উত্তর : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

হে যুবকেরা, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি যৌন মিলন ও পরিবারের ভরণ পোষণের ক্ষমতা রাখে সে যেন বিবাহ করে, কেননা এতে দৃষ্টি অবনমিত হয় এবং যৌনাঙ্গের হেফাযাত করা হয়। আর যে যুবক (স্ত্রীর ব্যয়ভার বহনের) ক্ষমতা রাখে না সে যেন সিয়াম পালন করে। কেননা সিয়াম পালন যৌন স্পৃহা দমিয়ে রাখে। (বুখারী : ৫০৬৬; মুসলিম : ১৪০০)

প্রশ্ন ২৫২ : কোন ব্যক্তি যদি সুন্নাত ও নফল সিয়াম বিনা কারণে ভঙ্গ করে তবে সেটা কি আবার কাযা করতে হবে?

উত্তর : না, তার কাযা বা কাফফারা কিছুই নেই, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ

নফল সিয়াম পালনকারী তার নিজের উপর কর্তৃত্বশীল। চাইলে সে সিয়াম পালন করে যাবে বা ইচ্ছা করলে তা নাও রাখতে পারে। (আহমাদ : ২৬৩৫৩; তিরমিযী : ৭৩২)

সমাপ্ত